www.doridro.com

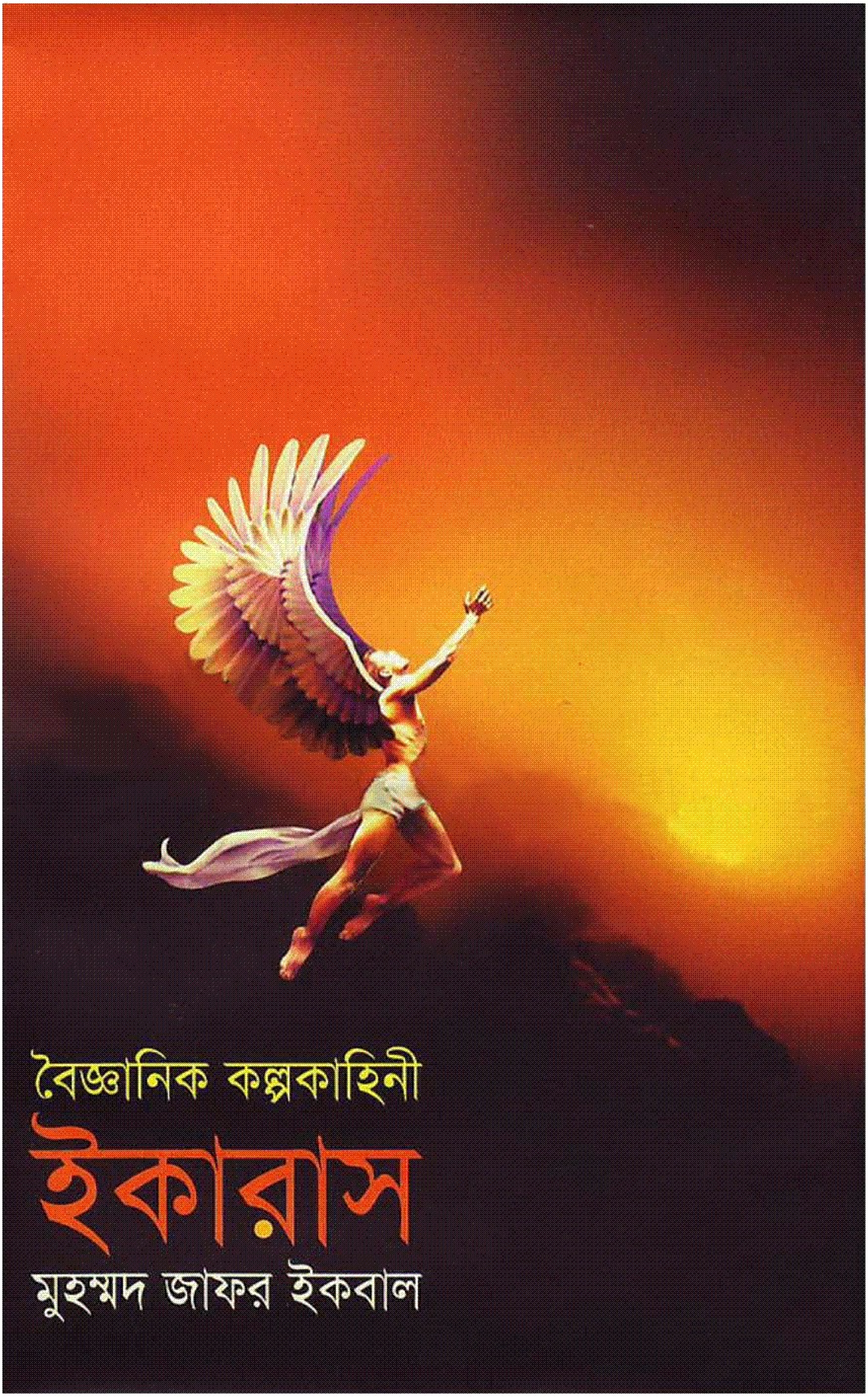

www.doridro.com
ikshafi@yahoo.com

উৎসর্গ

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ ঢাকায় গণহত্যা শুরু হওয়ার পর প্রথমবার যখন কয়েক ঘণ্টার জন্যে কারফিউ তুলে নেয়া হয় তখন একজন মা তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সন্তানকে নিয়ে শহরে বের হলেন। যেদিকেই তাকান সেদিকেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সাক্ষর।

মা তার সন্তানকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, এখন কী করতে হবে?"

সন্তান বলল, "মুক্তিযুদ্ধে যেতে হবে।"

মা বললেন, "আমার দুই পুত্রের মাঝে তুমিই এখন উপযুক্ত। আমি তোমাকেই আমাদের দেশের জন্যে দিতে চাই। তুমি যুদ্ধে যাও। এই দেশকে স্বাধীন করে ফিরে এসো। মনে রেখো তোমাকে কিন্তু বীরের মতো ফিরে আসতে হবে।"

যুদ্ধে পাঠানোর জন্যে মা সন্তানের ব্যাগ গুছিয়ে দিলেন। যখন সে বিদায় নিচ্ছিল মা তখন হাসিমুখে তাকে বিদায় দিলেন। ছেলে চোখের আড়াল হবার পর মা প্রথমবার আকুল হয়ে কাঁদলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস পর সেই তরুণ বীর-যাদ্ধা হয়ে তার দেশ এবং তার গর্ভধারিণী মায়ের কাছে ফিরে এসেছিল।

সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর ওয়াকার হাসান এবং তার বীর প্রসবিনী মাতা শামসুন নাহার ইসলামের জন্যে আমার ভালোবাসা এবং ভালোবাসা।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
২৪ জানুয়ারি, ২০০৮

www.doridro.com

“ডেডালাস ও তাহার পুত্র ইকারাস সমুদ্রবেষ্টিত ক্রীট দ্বীপ হইতে পলায়ন করিবার জন্যে তাহাদের শরীরে পাখির পালকে তৈরি ডানা সন্নিবিষ্ট করিল। উড্ডয়নের পূর্বে ডেডালাস তাহার পুত্র ইকারাসকে বলিল, বৎস, আকাশে উড়িবার সময় সূর্যের নিকটবর্তী হইও না। আমাদের শরীরে এই পালকগুলি মোম দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। সূর্যের উত্তাপে মোম গলিয়া পালকগুলি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তুমি সমুদ্রে পতিত হইবে।

উড্ডয়নকালে চপলমতি ইকারাস তাহার সাবধানবাণী বিস্মৃত হইয়া সূর্যের নিকটবর্তী হইল। সূর্যের উত্তাপে তাহার শরীরে সন্নিবিষ্ট মোম গলিয়া পালকগুলি খুলিয়া গেল।

হতভাগ্য ইকারাস তখন অনেক উচ্চ হইতে সমুদ্রে পতিত হইল।”

একটি গ্রিক উপাখ্যান

www.doridro.com

প্রথম পর্ব

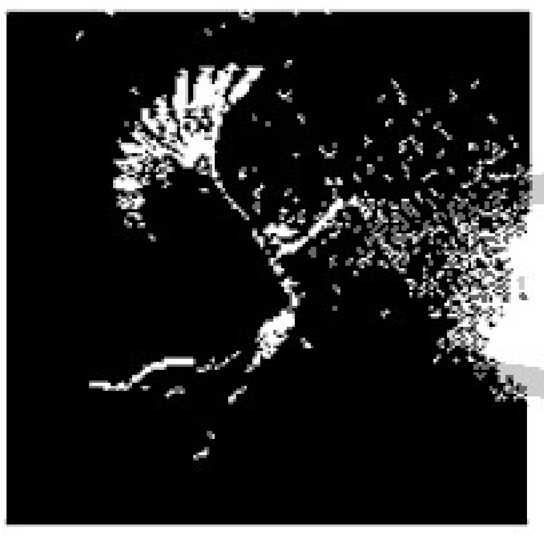

সমুদ্রের পানিতে সূর্যটা পুরোপুরি ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত জহুর বালুবেলায় চুপচাপ বসে রইল। সে প্রতিদিন এই সময়টায় সমুদ্রের তীরে আসে এবং চুপচাপ বসে সূর্যটাকে ডুবে যেতে দেখে। ঠিক কী কারণে দেখে তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নেই। সে খুবই সাধারণ মানুষ। প্রকৃতি বা প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য এসব ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই। যারা তাকে চেনে তাদের ধারণা সে বাউণ্ডুলে এবং ভবঘুরে ধরনের মানুষ। সেটি পুরোপুরি সত্য নয়—অল্প সময়ের ব্যবধানে তার একমাত্র মেয়ে এবং স্ত্রী মারা যাবার পর হঠাৎ করে সে পৃথিবীর আর কোনো কিছুর জন্যেই আকর্ষণ অনুভব করে না।

সূর্যটা পুরোপুরি ডুবে যাবার পর জহুর উঠে দাঁড়াল এবং নরম বালুতে পা ফেলে হেঁটে হেঁটে ঝাউগাছের নিচে ছোট টংঘরটাতে হাজির হলো। সেখানে কাঠের নড়বড়ে বেঞ্চটাতে বসে জহুর এক কাপ চায়ের অর্ডার দেয়। তার যে চা খেতে খুব ইচ্ছে করে তা নয়, তারপরেও সে রুটিনমাফিক এখানে বসে এক কাপ চা খায়। যে ছেলেটা দুমড়ানো কেতলি থেকে কাপে গরম পানি ঢালে, দুধ চিনি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে একটা চামচ দিয়ে সেটাকে ঘুঁটে তার সামনে নিয়ে আসে জহুর বসে বসে তার কাজকর্ম লক্ষ করে। কেন লক্ষ করে জহুর নিজেও সেটা জানে না। এখন তার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, একদিন থেকে পরের দিনের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই।

জহুর অন্যমনস্কভাবে চায়ের কাপে চুমুক দেয়, চা-টা ভালো হয়েছে না মন্দ হয়েছে জহুর সেটাও বুঝতে পারল না। অনেকটা যন্ত্রের মতো কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সে সামনের দিকে তাকালো এবং দেখল মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। জহুরের ভাসা ভাসাভাবে মনে হলো এই মানুষটা সে আগে কখনো দেখেছে কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছে

DORIDRO.COM

www.doridro.com

মনে করতে পারল না। মানুষটার সামনের দিকে চুল পাতলা হয়ে এসেছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি এবং গায়ে একটা ভুসভুসে নীল রঙের শার্ট।

জহুর মানুষটাকে এক নজর দেখে আবার তার চায়ের কাপে চুমুক দেয়, এবারে তার মনে হলো চায়ে চিনি একটু বেশি দেয়া হয়েছে—তবে তাতে তার কিছু আসে-যায় না। কোনো কিছুতেই তার কখনো কিছু আসে-যায় না। জহুর চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে আবার সামনের দিকে তাকালো, দেখাল মাথার সামনে চুল পাতলা হয়ে যাওয়া মধ্যবয়স্ক মানুষটা এখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে।

জহুর একটু অস্বস্তি অনুভব করে, সে নিজে সুযোগ পেলেই তার চারপাশের মানুষকে লক্ষ করে, কিন্তু সেটা সে করে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে। এই মানুষটি তাকে লক্ষ করছে সরাসরি, এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে। জহুর একটু ঘুরে বসবে কি না চিন্তা করছিল তখন মধ্যবয়স্ক মানুষটা সামনের বেঞ্চ থেকে উঠে তার পাশে এসে বসে জিজ্ঞেস করল, "ভাই। আপনি কী করেন?"

জহুর কী বলবে ঠিক বুঝতে পারল না, একজন মানুষ—যার সাথে চেনা পরিচয় নেই তাকে সরাসরি এভাবে এ রকম একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে কি না সেটা সে একটু চিন্তা করল। যে আসলে কিছুই করে না, সে কী বলে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে? জহুর অবশ্য বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল, বলল, "কিছু করি না।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "কিছু করতে চান?"

জহুর এবারে একটু অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকালো, জিজ্ঞেস করল, "আমি?"

"জি। আপনি কি কোনো কাজ করতে চান?"

"কাজ? আমি?"

"হ্যাঁ।" মানুষটা মাথা নেড়ে মুখের মাঝে হাসি হাসি একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে।

জহুর কয়েক সেকেন্ড মানুষটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কী কাজ?"

মানুষটা একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনি যদি কাজ করতে চান তাহলে বলি কী কাজ। যদি না করতে চান তাহলে—"

www.doridro.com

জহুর খুব বেশি হাসে না, কিন্তু এবারে সে একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, "কাজটা কী সেটা যদি না জানি তাহলে করতে চাইব কি না কেমন করে বলি? যদি বলেন অস্ত্র চোরাচালানের কাজ—"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা সবেগে মাথা নাড়ল, বলল, "না না না। কোনো বেআইনি কাজ না। খাঁটি কাজ। তবে—"

"তবে কী?"

"নয়টা পাঁচটা কাজ না। চব্বিশ ঘণ্টার কাজ।"

"চব্বিশ ঘণ্টার?"

"জি।"

"কোথায়?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা আবার তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "এটাই হচ্ছে সমস্যা।"

জহুর ভুরু কুঁচকে বলল, "সমস্যা?"

"জি।" মানুষটা মাথা নাড়ে। "এইটাই একটু সমস্যা।"

"কেন? সমস্যা কেন?"

"কাজটা অনেক দূরে। সমুদ্রের মাঝখানে।"

"সমুদ্রের মাঝখানে?"

মানুষটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল, "সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপের উপরে একটা হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। খুব হাইফাই হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের কাজ।"

"সমুদ্রের মাঝখানে হাইফাই হাসপাতাল?"

মানুষটি মাথা নাড়ল। জহুর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "সমুদ্রের মাঝখানে হাসপাতালের দরকার কী? সমুদ্রে কে থাকে?"

"সেটা অনেক লম্বা ইতিহাস।"

মানুষটি চুপ করে গেল, জহুর একটু অপেক্ষা করে কিন্তু মানুষটার মাঝে সেই লম্বা ইতিহাস বলার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। জহুর জিজ্ঞেস করল, "শুনি সেই লম্বা ইতিহাস।"

মানুষটি একটু ইতস্তত করে বলল, "আসলে সেটা নিয়ে আমরা বেশি কথা বলাবলি করি না। আমাদের কাদের স্যার হাসপাতালটা নিয়ে বেশি হইচই করতে না করেছেন।"

"কাদের স্যারটা কে?"

www.doridro.com

"কাদের স্যার এই হাসপাতাল তৈরি করেছেন। অনেক বড় ডাক্তার।"

জহুর মাথা নেড়ে বলল, "আমি পুরো ব্যাপারটা এখনো ভালো করে বুঝতে পারি নাই। কিন্তু আপনার যদি বলা নিষেধ থাকে, ব্যাপারটা গোপন হয় তাহলে থাক—"

মানুষটা ব্যস্ত হয়ে বলল, "না—না—না। এটা গোপন না, গোপন কেন হবে? কিন্তু আমাদের কাদের স্যার নিজের প্রচার চান না। সেই জন্যে এটা নিয়ে আমাদের বেশি কথাবার্তা বলতে না করেছেন। কিন্তু আপনাকে বলতে সমস্যা নাই—আপনি তো আর পত্রিকার লোক না।" কথা শেষ করে মানুষটা একটু হাসার চেষ্টা করল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো পত্রিকার লোকেরা খুব বিপজ্জনক মানুষ।

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি আসলে এখনো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝতে পারি নাই। একটা হাসপাতাল যদি সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপের মাঝে হয় তাহলে রোগীরা সেখানে যাবে কেমন করে? সাঁতার দিয়ে?"

জহুরের কথা শুনে মানুষটা হা হা করে হেসে উঠল, যেন এটা খুব মজার একটা কথা, হাসতে হাসতে বলল, "না না রোগীরা সাঁতরে সাঁতরে হাসপাতালে যায় না। রোগী আনার জন্যে হেলিকপ্টার আছে।"

"হেলিকপ্টার?" জহুর চোখ কপালে তুলে বলল, "হেলিকপ্টার?"

"জি।" মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "আপনাকে বলেছি এটা অনেক হাইফাই হাসপাতাল। এখানে হেলিকপ্টার আছে, স্পিডবোট আছে, বড় জাহাজ আছে, আলাদা পাওয়ার স্টেশন আছে আর হাসপাতাল তো আছেই।"

জহুর এবারে পুরো ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করতে পারে। হাসপাতাল বললেই চোখের সামনে যে রকম একটা বিবর্ণ দালানের ছবি ভেসে ওঠে, যার কোনায় কোনায় পানের পিকের দাগ থাকে, যার বারান্দায় রোগীরা শুয়ে থাকে এবং মাথার কাছে আত্মীয়স্বজন উদ্বিগ্ন মুখে পাখা দিয়ে বাতাস করে—এটা সে রকম হাসপাতাল না। এটা বড়লোকদের হাসপাতাল, তারা হেলিকপ্টারে করে এখানে আসে। এটা আসলে নিশ্চয়ই হাসপাতালের মতো না, এটা ফাইভস্টার হোটেলের মতো। এখানে যেটুকু না চিকিৎসা হয় তার থেকে অনেক বেশি আরাম আয়েস করা হয়। সমুদ্রের মাঝে ছোট একটা দ্বীপে বড়লোকেরা বিশ্রাম নিতে আসে, সময় কাটাতে

www.doridro.com

আসে। সে জন্যে এই হাসপাতালের কথা পত্রপত্রিকায় আসে না, সাধারণ মানুষ এর কথা জানে না। যাদের জানার কথা তারা ঠিকই জানে। পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে কেন জানি জহুরের একটু মন খারাপ হলো, সে ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মধ্যবয়স্ক মানুষটা জহুরের মন খারাপের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না, সে বেশ উৎসাহ নিয়ে বলতে থাকল, "বুঝলেন ভাই, নিজের চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। হাসপাতালের মেঝে তৈরি হয়েছে ইতালির মার্বেল দিয়ে—দেখলে চোখ উল্টে যাবে।"

জহুর বলল, "অ।"

"থাকার জন্যে আলাদা কোয়ার্টার। ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস। ট্যাপ খুললেই গরম পানি। নিজেদের ডিশ। ইন্টারনেট, কম্পিউটার সব মিলিয়ে একেবারে যাকে বলে ফাটাফাটি অবস্থা।"

জহুর এবারে একটু ক্লান্তি অনুভব করে, ছোট একটা হাই তুলে বলল, "আমার চাকরিটা কী রকম হবে?"

"অনেক রকম চাকরি আছে। আপনার কীরকম লেখাপড়া, কীরকম অভিজ্ঞতা তার ওপর চাকরি। তার ওপর বেতন।"

"আমার লেখাপড়া নাই।" জহুর দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই।"

মাঝবয়সী মানুষটার এবার খানিকটা আশাভঙ্গ হলো বলে মনে হলো। সরু চোখে জিজ্ঞেস করল, "লেখাপড়া নাই?"

"নাহ্। গ্রামে মানুষ হয়েছি, চাষ বাস করেছি। লেখাপড়ার দরকার হয় নাই, করিও নাই। পত্রিকাটা কোনোমতে পড়তে পারি। পত্রিকায় যে সব খবর থাকে এখন মনে হয় ওইটা না পড়তে পারলেই ভালো ছিল।"

"অ।" মানুষটা এবারে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বেশি লেখাপড়া না জানা মানুষেরও চাকরি আছে।"

জহুর একটু উৎসাহ দেখানোর ভান করে বলল, "আছে নাকি?"

"জি। আছে।"

"সেটা কী চাকরি?"

"এই মনে করেন কেয়ারটেকারের চাকরি।"

জহুর একটু হাসার ভঙ্গি করল, বলল, "তার মানে দারোয়ানের চাকরি?"

www.doridro.com

মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "সেটা আপনার ইচ্ছে হলে বলতে পারেন। চাকরি হচ্ছে চাকরি। দারোয়ানের চাকরিও চাকরি কেয়ারটেকারের চাকরিও চাকরি।"

জহুর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "নাহ্ ভাই। এই বয়সে আর দারোয়ানের চাকরি করার কোনো ইচ্ছা নাই।"

"তাহলে অন্য চাকরিও আছে—"

জহুর এবারে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্।"

"কেন না?"

জহুর মানুষটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আসলে ভাই আপনি যে রকম হাইফাই হাসপাতালের বর্ণনা দিলেন, আমার সেই রকম হাসপাতালে চাকরি করার কোনো ইচ্ছা নাই। আমি মনে করেন চাষা মানুষ, বড়লোক সে রকম দেখি নাই। দেখার ইচ্ছাও নাই। এই রকম বড়লোকদের চাকর-বাকরের কাজ করার ইচ্ছা করে না।"

মাঝবয়সী মানুষটা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বুঝেছি। আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বুঝেছি। আপনি যে রকম করে ভাবেন আমিও সেই রকম করে ভাবি। তবে—"

"তবে কী?"

"আপনি চাকরি করতে না চাইলে নাই। তবে আমি বলি কী—আপনি হাসপাতালটা একটু দেখে আসেন।"

জহুর একটু অবাক হয়ে বলল, "দেখে আসব?"

"জি। এটা একটা দেখার মতো জায়গা। কাদের স্যার যদি পাবলিকদের এটা দেখার জন্যে টিকেট সিস্টেম করতেন তাহলে মানুষ টিকেট কিনে দেখে আসত।"

"আচ্ছা!"

"জি।" মানুষটা মাথা নাড়ে, বলে, "আপনার চাকরি করার কোনো দরকার নাই। শুধু একটা ইন্টারভিউ দিয়ে আসেন। এই হাসপাতালটা দেখার মাত্র দুইটা উপায়। এক হচ্ছে রোগী হয়ে যাওয়া। আর দুই হচ্ছে চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া।"

জহুর কিছুক্ষণ মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি চাকরি না চাইলেও ইন্টারভিউ দিব?"

"কেন দিবেন না?"

www.doridro.com

"কীরকম করে দিব? কেমন করে যাব?"

"আমি আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। জেটি থেকে সপ্তাহে দুই দিন একটা ট্রলার হাসপাতালে যায়।"

জহুর মাথা নেড়ে বলল, "না ভাই! আমার ইচ্ছা নাই।"

"কেন ইচ্ছা নাই? যে জায়গাটা মানুষ পয়সা দিয়েও দেখতে পারে না, আপনি সেটা ফ্রি দেখে আসবেন। যাতায়াত থাকা খাওয়া ফ্রি—"

জহুর একটু হেসে ফেলল, বলল, "ভাই আমি গরিব মানুষ কথা সত্যি। কিন্তু তাই বলে একটা কিছু ফ্রি হলেই আমি হামলে পড়ি না!"

মানুষটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমি সেটা বলি নাই! আমি বলেছি জায়গাটা দেখে আসার জন্যে। এটা একটা দেখার মতো জায়গা।"

জহুর কিছুক্ষণ মানুষটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনি সত্যি কথাটা বলেন দেখি। কেন আপনি আমাকে এত পাঠাতে চাইছেন। এখানে অন্য কোনো ব্যাপার আছে।"

মানুষটা প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গিয়ে অপ্রস্তুতের মতো একটু হেসে ফেলল, হাসি থামিয়ে বলল, "আমি আসলে এই হাসপাতালের একজন রিক্রুটিং এজেন্ট। যদি হাসপাতাল আমার সাপ্লাই দেয়া কোনো মানুষকে চাকরি দেয় তাহলে আমি একটা কমিশন পাই।"

জহুর এবার বুঝে ফেলার ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল, বলল, "এইবার বুঝতে পারলাম।"

মানুষটা বলল, "আপনাকে আমি কয়েকদিন থেকে লক্ষ করছি। চুপচাপ মানুষ, কোনোরকম হাঙ্গামা হুজ্জোতের মাঝে নাই। সেইদিন দেখলাম ওই পকেটমারকে পাবলিকের হাত থেকে বাঁচালেন। আপনি না থাকলে বেকুবটাকে পাবলিক পিটিয়ে মেরে ফেলত। কী ঠান্ডা মাথায় কাজটা করলেন, অসাধারণ! যখন পুলিশের সাথে কথা বললেন আপনার কোনো তাপ উত্তাপ নাই। আপনি রাগেন না—আপনি ভয়ও পান না। ঠান্ডা মানুষ।"

জহুরের সেদিনের ঘটনাটা মনে পড়ল, সমুদ্রের তীরে পকেট মারতে গিয়ে কমবয়সী একটা ছেলে ধরা পড়ল। ভদ্রঘরের মানুষজন তখন তাকে কী মারটাই না মারল, সে গিয়ে না থামালে মেরেই ফেলত। লাশটা ফেলে রেখে সবাই সরে পড়ত। যেন মানুষের লাশ না, কুকুর বেড়ালের লাশ।

মানুষটা বলল, "হাসপাতালটা আসলে আপনাদের মতো ঠান্ডা মানুষ খোঁজে। আমার মনে হচ্ছিল আপনি ইন্টারভিউ দিলেই চাকরি পেয়ে

www.doridro.com

যাবেন।"

"আর আমি চাকরি পেলেই আপনি কমিশন পাবেন?"

"অনেকটা সেই রকম।"

জহুর এবার উঠে দাঁড়াল, বলল, "ভাই আপনার এইবারের কমিশনটা গেল। চোখ কান খোলা রাখেন আর কাউকে পেয়ে যাবেন। দেশে আজকাল চাকরির খুব অভাব—"

জহুরের সাথে সাথে মাঝবয়সী মানুষটাও উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে নীল রঙের একটা কার্ড বের করে জহুরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নেন ভাই। এইটা রাখেন।"

"এইটা কী?"

"ইন্টারভিউ কার্ড। আপনি যদি মত পাল্টান তাহলে পরশু দিন জেটিতে আসেন। বড় ট্রলার, নাম হচ্ছে এম.ভি. শামস। কার্ড দেখালেই আপনাকে তুলে নেবে।"

জহুর কার্ডটা হাতে নিয়ে বলল, "আর যদি না আসি?"

"তাহলে কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলে দিবেন—অন্য কাউকে দিবেন না।"

"ঠিক আছে।" জহুর লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে, তখন পেছন থেকে মাঝবয়সী মানুষটা বলল, "আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি।"

"কী জিনিস?"

"আপনি যদি ইন্টারভিউ দিতে আসেন তাহলে কাদের স্যারের সাথে দেখা হবে। পৃথিবীতে এই রকম দুইটা মানুষ নাই।"

"কেন?"

"সেইটা বলে বোঝানো যাবে না—আপনার নিজের চোখে দেখতে হবে। স্যার নিজে সবার ইন্টারভিউ নেন। মালী থেকে শুরু করে সার্জন—সবার।"

"অ।"

"কাদের স্যার চোখের দিকে তাকিয়ে ভেতরের সবকিছু বুঝে ফেলেন।"

"তাই নাকি?"

"জি।" মানুষটা মাথা নাড়ল, "চোখ দুইটা ধারালো ছোরার মতো। কেটে ভেতরে ঢুকে যায়।"

জহুর কোনো কথা না বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে থাকে। সন্ধ্যের

www.doridro.com

বাতাসে সমুদ্রের তীরের ঝাউগাছগুলো হাহাকারের মতো এক ধরনের শব্দ করছে, সেই শব্দ শুনলেই কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়।

দুই দিন পর জহুর আবিষ্কার করল সে জেটিতে এসে এম.ভি. শামস খুঁজে বের করে তার নীল রঙের ইন্টারভিউ কার্ড দেখিয়ে সেখানে চেপে বসেছে। কেন বসেছে নিজেও জানে না।

www.doridro.com

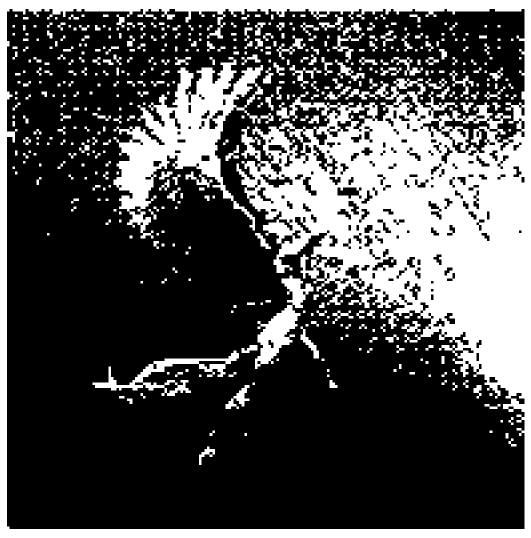

ট্রলারে বসে থাকা মানুষগুলো কেউই খুব বেশি কথা বলে না—তাতে অবশ্যি জহুরের খুব সমস্যা হলো না, বরং একটু সুবিধেই হলো, কারণ সে নিজেও খুব বেশি কথা বলে না। ট্রলারের ইঞ্জিনের বিকট শব্দ—কথা বলতে হলেও সেটা বলতে হয় চেঁচিয়ে, কানের কাছে মুখ লাগিয়ে। যে হাসপাতালের মেঝে ইতালি থেকে মার্বেল এনে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে রোগী আনা হয় হেলিকপ্টারে সেই হাসপাতালে ইন্টারভিউ নেয়ার মানুষগুলোর জন্যে কেন আরেকটু ভালো ট্রলারের ব্যবস্থা করা যায় না, সেটা জহুর বুঝতে পারল না।

ট্রলারের ছাদে বসে জহুর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। জহুরের মনে হয় সমুদ্রের একটা নিজস্ব মেজাজ আছে আর সেই মেজাজের ওপর নির্ভর করে তার একটা নিজস্ব রূপ তৈরি হয়। যখন মেজাজ খারাপ থাকে তখন পানির রং হয় কালো, ঢেউগুলো ফুঁসে ওঠে। এই মুহূর্তে সমুদ্রের মনে হয় ফুরফুরে হালকা মেজাজ তাই সমুদ্রের পানির মাঝে স্বচ্ছ হালকা একটা নীল রং, ছোট ছোট ঢেউ, তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। জহুর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক দূরে হালকা ধূসর বর্ণের একটা দ্বীপ দেখতে পেল। তারা এখন এই দ্বীপটাতেই যাচ্ছে।

খুব ধীরে ধীরে দ্বীপটা স্পষ্ট হতে থাকে, জহুরের ধারণা ছিল সে মাথা উঁচু করে থাকা বড় বড় দালান দেখতে পাবে কিন্তু সে রকম কিছু দেখল না। যতই কাছাকাছি আসতে থাকে দ্বীপটাকে ততই গাছগাছালি ঢাকা অত্যন্ত সাধারণ একটা দ্বীপ বলে মনে হতে থাকে। খুব কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ একটা ছোট হেলিকপ্টারকে উঠে যেতে দেখা গেল—এটি না দেখলে এখানে যে কোনো বৈশিষ্ট্য আছে সেটা বোঝার কোনো উপায়ই থাকত না।

ট্রলারটা জেটিতে থেমে যাওয়ার পর জহুর অন্য মানুষগুলোর সাথে ট্রলার থেকে নেমে আসে। জেটিতে খাকি পোশাক পরা একজন মানুষ

www.doridro.com

দাঁড়িয়ে ছিল, সে সবাইকে কাছাকাছি একটা ছোট ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের সবাইকে একজন একজন করে একটা নীল পর্দার সামনে দাঁড়া করিয়ে একটা ছবি তুলে তাদের নাম পরিচয় লিখে আইডি কার্ড তৈরি করে দিল। একজন মহিলা জহুরের হাতে কার্ডটি তুলে দিয়ে বলল, "যতক্ষণ এখানে থাকবেন এটা গলায় ঝুলিয়ে রাখবেন।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

"মনে রাখবেন এটা খুব জরুরি। এক সেকেন্ডের জন্যেও খুলবেন না। খুললে কিন্তু ঝামেলা হতে পারে।"

"ঝামেলা?"

"হ্যাঁ। এখানে সিকিউরিটি খুব টাইট।"

একটা হাসপাতালে সিকিউরিটি কেন টাইট হতে হবে জহুর সেটা খুব ভালো বুঝতে পারল না, কিন্তু সে এটা নিয়ে কোনো প্রশ্নও করল না। সে কম কথার মানুষ।

"আপনি চলে যাওয়ার সময় আই.ডি. কার্ডটা এখানে জমা দিয়ে যাবেন।"

জহুর মাথা নাড়ল, "যাব।"

"এই দ্বীপে খাবার জায়গা আছে—আই.ডি. কার্ডটা দেখিয়ে যখন যা খেতে চান খেতে পারবেন।"

"ঠিক আছে।"

"পিছন দিকে একটা ডর্মিটরি আছে, যদি রাতে থাকতে হয় সেখানে থাকতে পারবেন।"

"ঠিক আছে।"

"আপনার যখন ইন্টারভিউ নেয়ার সময় হবে আপনাকে ডেকে আনা হবে।"

জহুর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কোথা থেকে ডেকে আনা হবে?"

"আপনি যেখানেই থাকেন সেখান ডেকে আনবে। সেটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।"

সে যেখানেই থাকবে তাকে সেখান থেকেই কীভাবে ডেকে আনবে সেটা জহুর ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু সে সেটা নিয়ে কোনো কথা বলল না, আইডি কার্ডটা গলায় ঝুলিয়ে বের হয়ে এলো।

দ্বীপের কিনারা দিয়ে একটা খোয়া বিছানো রাস্তা চলে গেছে—জহুর

www.doridro.com

সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে। একটু পরপর বসার জন্যে পাথরের বেঞ্চ বসানো আছে, এই পাথরগুলো না জানি কোথা থেকে এনেছে। দ্বীপটা শুরুতে কেমন ছিল অনুমান করা কঠিন, এখন গাছগাছালিতে ঢাকা। খোয়া বিছানো রাস্তার দুই পাশে বড় বড় নারকেল গাছে, সমুদ্রের বাতাসে তার পাতাগুলো শিরশির শব্দ করে কাঁপছে।

জহুর সরু রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরো এলাকাটা সম্পর্কে একটা ধারণা করার চেষ্টা করে। দ্বীপের মাঝামাঝি যে বড় দালানটি রয়েছে সেটা সম্ভবত মূল হাসপাতাল, দালানটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে শুধু সামনের একটা বড় গেট দিয়ে সেখানে ঢোকা যায়। তাই এটাকে দেখে ঠিক হাসপাতাল মনে হয় না, মনে হয় একটা জেলখানা।

দ্বীপের খোয়া বাঁধানো রাস্তাটি ধরে হেঁটে হেঁটে জহুর দ্বীপের শেষ প্রান্তে চলে আসে। অনমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে জহুর লক্ষ করল, হঠাৎ করে খোয়া বাঁধানো রাস্তা শেষ হয়ে সেখানে খানিকটা পথ কংক্রিটের, সেটা শেষ হয়ে আবার খোয়া বাঁধানো পথ শুরু হয়েছে। জহুর দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করে—হঠাৎ করে খানিকটা জায়গা কংক্রিটের কেন? সে ডানে-বামে তাকালো, তার মনে হলো কংক্রিটে বাঁধানো অংশটুকু আসলে একটা সুরঙ্গের উপরের অংশটুকু। সুরঙ্গের অন্যপাশে মাটি ফেলে ঘাস লাগানো হয়েছে, এখানে লাগাতে পারেনি। দ্বীপের মাঝখানে যে হাসপাতালটি আছে সেখান থেকে সুরঙ্গটা এসেছে—সমুদ্রের তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে। জহুর ভালো করে তাকিয়ে দেখে সুরঙ্গটা যেখানে শেষ হবার কথা সমুদ্রের তীরে সেখানে গাছগাছালি ঢাকা জায়গায় দুটো স্পিডবোট, ভালো করে না তাকালে সেটা দেখা যায় না। ব্যাপারটা হঠাৎ করে জহুরের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়—হাসপাতালের ভেতর থেকে হঠাৎ পালিয়ে যাওয়ার এটা একটা গোপন রাস্তা। জহুরের কাছে ব্যাপারটা খানিকটা দুর্বোধ্য ঠেকে—হাসপাতাল থেকে কেউ কেন কখনো গোপন পথে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে?

জহুরের একবার ইচ্ছে করল নিচে নেমে গিয়ে গোপন পথের দরজাটি দেখে আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা করল না। এটা আসলেই যদি গোপন সুরঙ্গ হয়ে থাকে তাহলে সে যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এটা দেখার চেষ্টা করে তাহলে অনেকেই তার ওপর সন্দিহান হয়ে উঠবে। একদিনের জন্যে বেড়াতে এসে মানুষজনকে বিরক্ত করার তার কোনো ইচ্ছে নেই। হয়তো এই মুহূর্তেই তাকে কেউ কেউ তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে। কাজেই জহুর ভান

www.doridro.com

করল সে কিছুই দেখেনি। অন্যমনস্কভাবে এদিক-সেদিক তাকিয়ে সে ইতস্তত ভাব করে আবার হেঁটে সামনে এগিয়ে যায়।

দ্বীপটা নিশ্চয়ই বেশ ছোট। কারণ বেশ অল্প সময়ের মাঝেই সে পুরোটা ঘুরে এলো। দ্বীপটা সাজানো-গোছানো এবং সুন্দর, মানুষজন বলতে গেলে নেই, পুরো দ্বীপটাই বেশ নির্জন। মূল দালানের বাইরে কয়েকটা ছোট ছোট দালান রয়েছে, এর মাঝে কোনো একটা সম্ভবত ডর্মিটরি। জহুর যদি সত্যি সত্যি এখানে চাকরি নেয় তাহলে তার এ রকম কোনো একটা ডর্মিটরিতে তার দিন কাটাতে হবে।

জহুর যখন হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে তার মার্বেল পাথরের মেঝে, হেলিকপ্টারের হেলিপ্যাড এসব দেখবে কি না চিন্তা করছিল তখন খাকি পোশাক পরা একজন মানুষ লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে এলো। মানুষটা কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন?"

জহুর মাথা নাড়ল। খাকি পোশাক পরা মানুষটা বলল, "আপনার নাম জহুর হোসেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমার সাথে আসেন—" বলে মানুষটা ঘুরে জহুরের জন্যে অপেক্ষা না করেই হাঁটতে শুরু করে।

জহুর কোনো কথা না বলে মানুষটার পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে। খাকি পোশাক পরা মানুষটা হাসপাতালের দিকে এগিয়ে যায়, সামনে একটা বড় গেট, গেটটা বন্ধ। খাকি পোশাক পরা মানুষটা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তার গলায় ঝোলানো কার্ডটা গেটের নির্দিষ্ট একটা ফোকরে ঢুকিয়ে দিতেই গেটটা ঘরঘর শব্দ করে খুলে গেল।

খাকি পোশাকপরা মানুষটার সাথে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই গেটটা আবার ঘরঘর শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। খাকি পোশাক পরা মানুষটা জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের তিনতলায় যেতে হবে।"

"তিনতলায়?"

"হ্যাঁ। স্যার তিনতলায় বসেন।"

"কোন স্যার?"

"কাদের স্যার।"

জহুর বলল, "অ।"

www.doridro.com

খাকি পোশাক পরা মানুষটা ভেবেছিল কাদের স্যার কে সেটা নিয়ে জহুর কোনো একটা প্রশ্ন করবে, জহুর কোনো প্রশ্ন করল না তাই সে নিজে থেকেই বলল, "কাদের স্যার আমাদের এম.ডি.।"

জহুর বলল, "অ।"

"কাদের স্যার নিজে সবার ইন্টারভিউ নেন।"

জহুর আবার বলল, "অ।"

"কাদের স্যারের মতোন দ্বিতীয় মানুষ কেউ কখনো দেখে নাই।"

জহুর ভাবল একবার জিজ্ঞেস করে কেন কাদের স্যারের মতো দ্বিতীয় মানুষ কেউ কখনো দেখে নাই, কিন্তু কী ভেবে শেষ পর্যন্ত কিছু জিজ্ঞেস করল না, বলল, "অ।"

জহুরের জবাব দেবার ধরন দেখে খাকি পোশাক পরা মানুষটা এর মাঝে তার সাথে কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে মুখ শক্ত করে এগিয়ে যায়, জহুরও কোনো কথা না বলে তার পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে।

একটা লিফটে করে তিনতলায় উঠে যাওয়ার পর জহুর প্রথমবার হাসপাতালের ভেতরটা ভালো করে দেখার সুযোগ পেল। একটা বিশাল করিডোরের দুই পাশে ছোট ছোট অনেকগুলো কেবিন। হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ করে একটা কেবিনের জানালায় তার দৃষ্টি আটকে যায়, আঠারো উনিশ বছরের একটা মেয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, মেয়েটির মুখ পাথরের মতো ভাবলেশহীন, দেখে কেন জানি বুকের ভেতরটুকু কেঁপে ওঠে। জহুর সেখানে দাঁড়িয়ে গেল, মেয়েটি সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়েছে। দেখে মনে হয় বুঝি কিছু একটা বলবে। জহুর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কিছু বলবে।"

মেয়েটি মাথা নাড়ল। জহুর বলল, "বল।"

মেয়েটি কোনো কথা না বলে জহুরের দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। খাকি পোশাক পরা মানুষটা তখন জহুরের পিঠে হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে বলল, "দাঁড়াবেন না। চলেন।"

জহুর এই প্রথমবার নিজে থেকে কথা বলল। খাকি পোশাক পরা মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই মেয়েটার কী হয়েছে?"

মানুষটা কাঁধ বাঁকিয়ে বলল, "মানসিক রোগ।"

জহুর ভুরু কুচকে জিজ্ঞেস করল, "মানসিক রোগ?"

www.doridro.com

"হ্যাঁ।"

"এইটা কি মানসিক রোগের হাসপাতাল?"

"এইটা সব রোগের হাসপাতাল।"

সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপের মাঝখানে কেমন করে সব রোগের হাসপাতাল তৈরি করে রাখা হয়েছে জহুরের সেটা জানার ইচ্ছে করছিল কিন্তু খাকি পোশাক পরা এই মানুষটাকে জিজ্ঞেস করে সেটা জানা যাবে বলে তার মনে হলো না, তাই সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। হেঁটে ঘুরে যেতে যেতে সে আবার ঘুরে তাকালো, জানালার কাছে তখনো ভাবলেশহীন চোখে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হেঁটে যেতে যেতে কেবিনের নম্বরটি জহুরের চোখে পড়ল তিনশ তেত্রিশ। তিন তিন তিন।

খাকি পোশাক পরা মানুষটি করিডোরের শেষ মাথায় একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইন্টারকম সুইচে চাপ দিয়ে বলল, "স্যার।"

জহুর ইন্টারকমে একটা ভারী গলা শুনতে পেল, "বল।"

"জহুর হোসেন ইন্টারভিউ দিতে এসেছে।"

"ভেতরে পাঠিয়ে দাও।"

খাকি পোশাক পরা মানুষটি জহুরকে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করল। জহুর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে একটু হকচকিয়ে যায়। সে মনে মনে খুব হাল ফ্যাশনের একটা অফিস দেখবে বলে ভেবেছিল, কিন্তু এটা মোটেও সে রকম নয়। ঘরের ভেতর চারপাশে অসংখ্য যন্ত্রপাতি, তার মাঝখানে কাঁচাপাকা চুলের একজন মানুষ একটা মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে কী একটা দেখছিল, মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, "এক সেকেন্ড দাঁড়ান।"

কাঁচাপাকা চুলের মানুষটি নিশ্চয়ই ডক্টর কাদের, সে এক সেকেন্ড দাঁড়ানোর কথা বললেও বেশ কিছুক্ষণ মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলল না। জহুর অবাক হলো না। ক্ষমতাশালী মানুষেরা সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের ক্ষমতা বোঝানোর জন্যে এটা করে, তাদেরকে অকারণে দাঁড় করিয়ে রাখে। জহুর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে থাকে। বেশির ভাগ যন্ত্রপাতিই সে চেনে না, শুধু ঘরের দেয়ালে লাগানো টেলিভিশন স্ক্রিনগুলো সে চিনতে পারল। এক একটা স্ক্রিনে দ্বীপের এক একটা সমুদ্রতীর দেখা যাচ্ছে। সে যখন দ্বীপটাকে ঘিরে ঘুরছিল তখন তাকে নিশ্চয়ই এই স্ক্রিনগুলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ভালোই হয়েছে সুরঙ্গটা নিয়ে সে বেশি

www.doridro.com

কৌতূহল দেখায়নি।

ডক্টর কাদের এক সময় মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলে জহুরের দিকে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বলল, "বসেন।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "বসতে হবে না।"

জহুরের কথা শুনে ড. কাদেরের মুখে কোনো ভাবান্তর হলো না, সে শান্ত মুখে বলল, "আমার এখানে ইন্টারভিউ দিতে হলে সামনে বসতে হবে। বসে হাত দুটো টেবিলে রাখতে হবে।"

জহুরের ইচ্ছে হলো সে জিজ্ঞেস করে কেন তার চেয়ারে বসে টেবিলে হাত রাখতে হবে কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস না করে চেয়ারে বসে টেবিলে হাত রাখল। ডক্টর কাদের এসে টেবিলের অপর পাশে রাখা তার নরম আরামদায়ক চেয়ারটিতে বসে কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখল। কি-বোর্ডে কিছু একটা লিখে ডক্টর কাদের জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যতক্ষণ আপনার সাথে কথা বলব আপনি ততক্ষণ হাতটা টেবিলে চাপ দিয়ে রাখবেন।"

কী কারণে হাত চাপ দিয়ে রাখতে হবে জহুরের সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু সে সেটাও জানতে চাইল না, টেবিলে হাতটা একটু জোরে চেপে ধরল। ডক্টর কাদের বলল, "চমৎকার। এবার আমি প্রশ্ন করব আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন।"

জহুর বলল, "ঠিক আছে।"

ডক্টর কাদের মাথাটা একটু এগিয়ে এনে বলল, "শুধু একটা ব্যাপার।"

"কী ব্যাপার?"

"আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করব আপনি তার ভুল উত্তর দেবেন।"

জহুর ভুরু কুঁচকে বলল, "ভুল উত্তর?"

"হ্যাঁ। আপনি কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না।"

"সঠিক উত্তর দিতে পারব না?"

"না। প্রত্যেকটা উত্তর হতে হবে মিথ্যা—"

"মিথ্যা?"

ড. কাদের মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। মিথ্যা।"

কেন প্রশ্নের উত্তর মিথ্যা দিতে হবে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে জহুর থেমে গেল। তার কেন জানি মনে হলো এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তরটা সে ডক্টর কাদেরের কাছ থেকে পাবে না।

www.doridro.com

ডক্টর কাদের জিজ্ঞেস করল, "আমরা তাহলে শুরু করি?"

"করেন।"

"আপনার নাম কী?"

জহুর বলল, "আমার নাম ডক্টর কাদের।"

জহুরের উত্তর শুনে ডক্টর কাদেরের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, সে হাসিমুখে কম্পিউটারের দিকে তাকালো এবং হঠাৎ করে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে ভুরু কুঁচকে জহুরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন আপনার নাম?"

"আমি বলেছি আমার নাম ডক্টর কাদের।"

ডক্টর কাদের আবার কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকালো এবং তার মুখ কেমন জানি গম্ভীর হয়ে ওঠে। সে জিব দিয়ে নিচের ঠোঁট ভিজিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি কখনো মানুষ খুন করেছেন?"

"করেছি।"

ডক্টর কাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার জহুরের দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করল, "কয়টা?"

"একটা।"

"কীভাবে?"

"একটা গামছা দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরেছিলাম।"

"কেন খুন করেছেন?"

"পূর্ণিমার রাতে যখন অনেক বড় চাঁদ ওঠে তখন আমার মানুষ খুন করার ইচ্ছে করে।"

ডক্টর কাদের কিছুক্ষণ তার কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকে, জহুর বুঝতে পারে কোনো একটা বিষয় ডক্টর কাদেরকে খুব বিভ্রান্ত করে দিয়েছে কিন্তু সেটা কী জহুর ঠিক বুঝতে পারল না।

ডক্টর কাদের এবারে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "আপনি কি আকাশে উড়তে পারেন?"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "পারি।"

"কীভাবে ওড়েন?"

"পাখা দিয়ে।"

"আপনার কী পাখা আছে?"

"আছে। আমার দুটি বিশাল পাখা আছে। ভাঁজ করে পিঠে লুকিয়ে

www.doridro.com

রাখি—কেউ দেখতে পায় না।"

"আপনি কখন আকাশে ওড়েন?"

"সন্ধ্যেবেলা সূর্য ডুবে গেলে আমি আকাশে উড়ি। প্রতিদিন।"

ডক্টর কাদের কিছুক্ষণ কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে থেকে জহুরের দিকে তাকালো, বলল, "আমার ইন্টারভিউ শেষ।"

জহুর টেবিল থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে বলল, "আমি কি এখন যেতে পারি?"

"একটু দাঁড়ান।"

জহুর চেয়ার থেকে উঠে একটু সরে দাঁড়াল। ডক্টর কাদের বলল, "আমি আপনাকে আমার এখানে চাকরি দিতে চাই।"

জহুর কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। ডক্টর কাদের বলল, "আপনি কি এখানে চাকরি করবেন?"

জহুর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি কেন আমাকে চাকরি দিতে চাইছেন?"

"কারণ আপনার নার্ভ ইস্পাতের মতো শক্ত।"

"আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমি জানি। আপনি শান্ত গলায় শরীরের একটি লোমকূপেও একটু আলোড়ন না করে ভয়ঙ্কর বিচিত্র কথা বলে ফেলতে পারেন। আমি আগে এ রকম কখনো কাউকে দেখিনি।"

"তার মানে কী?"

তার মানে আপনি কখনো উত্তেজিত হন না—আপনি অত্যন্ত ঠান্ডা মানুষ। ঠান্ডা মাথায় শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমার আপনার মতো একজন মানুষের দরকার।"

জহুর বলল, "অ।"

"আপনি কি আমার এখানে চাকরি করবেন?"

জহুর মাথা তুলে ডক্টর কাদেরের চোখের দিকে তাকালো, জিজ্ঞেস করল, "তার আগে আমার জানা দরকার আপনি কী করেন?"

ডক্টর কাদের থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি কী করি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন?"

জহুর শান্ত গলায় বলল, "এই দ্বীপের মাঝে আপনি যে হাসপাতালটা

www.doridro.com

বানিয়েছেন, এটা আসলে হাসপাতাল না। এটা অন্য কিছু। আমি জানতে চাইছি এটা কী?"

ডক্টর কাদের কয়েক মুহূর্ত জহুরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এটা হাসপাতাল।"

জহুর খুব বেশি হাসে না, তার মুখের মাংসপেশি হাসতে অভ্যস্ত নয় তাই সে যখন হাসে তাকে কেমন যেন বিচিত্র দেখায়। জহুর তার সেই বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমার কাছে কোনো যন্ত্র নাই, কিন্তু যখন কেউ মিথ্যা কথা বলে আমি সেটা বুঝতে পারি।"

ডক্টর কাদের কোনো কথা বলল না, জহুর নিচু গলায় বলল, "কোথাও কাজ করার আগে আমার জানা দরকার সেখানে কী হয়। আমি জানি এটা আসলে হাসপাতাল না। এটা অন্য কিছু। এখানে কাজ করার আগে আমাকে জানতে হবে এটা কী।"

ডক্টর কাদের কিছুক্ষণ জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কেমন করে জানেন এটা অন্য কিছু?"

"আমি জানি। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"তা ছাড়া তিনশ তেত্রিশ নম্বর কেবিনে যে মেয়েটি আছে—"

ডক্টর কাদের হাত তুলে জহুরকে থামাল। "ঠিক আছে। আপনি এখানে আরো একদিন থাকেন। কাল ভোরে আমি আপনার সাথে কথা বলব। আমি আপনাকে বলব এটা কী।"

এই জায়গাটা কী জানার জন্যে জহুরকে অবশ্যি পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না—সেদিন রাতেই সে সেটা জানতে পারল।

www.doridro.com

গভীর রাতে জহুরের ঘুম ভাঙল মেশিনগানের গুলির শব্দে। শুধু মেশিনগানের গুলির শব্দ নয়, তার সাথে অনেকগুলো হেলিকপ্টারের শব্দ। সে অনেক মানুষের গলার আওয়াজ এবং মানুষের ছোটাছুটির শব্দও শুনতে পেল। জহুর কখনো কোনো যুদ্ধ দেখেনি কিন্তু তার মনে হলো এই দ্বীপটা হঠাৎ একটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেছে এবং এটাকে সৈন্যরা আক্রমণ করেছে।

জহুর ডর্মিটরিতে যে ঘরটিতে ঘুমুচ্ছিল সেখানে তার বিছানা ছাড়াও আরো তিনটি বিছানা ছিল। সেই বিছানাগুলোতে তার মতোই আরো কয়েকজন মানুষ ঘুমিয়েছিল এবং হেলিকপ্টার আর মেশিনগানের শব্দ শুনে তারাও লাফিয়ে উঠে বসে এবং আতঙ্কে ছোটোছুটি শুরু করে দেয়। তাদের ছোটাছুটি দেখে জহুরের কেমন যেন হাসি পেয়ে যায়, সে নিচু গলায় তাদেরকে বলল, "আপনারা শুধু শুধু ছুটোছুটি করবেন না—মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকেন।"

একজন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "যদি কিছু হয়?"

"হবে না। এখানে ডাকাত পড়েনি, পুলিশ মিলিটারি এসেছে।"

মানুষগুলো মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, "আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমি জানি। এই দেশের কোনো ডাকাতের দলের হেলিকপ্টার নাই।"

জহুর তার শার্ট প্যান্ট পরল, জুতো পরল। একজন সেটা দেখে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী করেন?"

"বাইরে যাই। দেখে আসি কী হচ্ছে।"

"সর্বনাশ! যদি কিছু হয়?"

"কিছু হবে না। আমি চোরও না, ডাকাতও না। আমার কিছু হবে কেন?"

www.doridro.com

জহুর ডর্মিটরির দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলো। দ্বীপের মাঝামাঝি হাসপাতালের গেটের সামনে বেশ কিছু মানুষের ভিড়, অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, তবে মনে হয় অস্ত্র হাতে অনেক পুলিশ আর মিলিটারি। তারা কোনো খবর পেয়ে এখানে এসেছে। ঠিক কেন এসেছে, কাকে ধরতে এসেছে জহুর কিছুই জানে না কিন্তু সে অনুমান করতে পারল নিশ্চিতভাবেই তারা প্রথমেই ডক্টর কাদেরকে ধরবে। জহুর হঠাৎ করে বুঝতে পারল ডক্টর কাদের সম্ভবত তার গোপন সুরঙ্গ দিয়ে এখন হাসপাতালের ভেতর থেকে সরাসরি দ্বীপের কিনারায় এসে স্পিডবোটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

জহুরের মনে হলো পুলিশ মিলিটারির দলটাকে সেটা জানানো উচিত। কিন্তু তার মতো চেহারার এত সাধারণ একজন মানুষের কথাকে পুলিশ মিলিটারি কোনোভাবেই গুরুত্ব দেবে না, উল্টো সে নিজে অন্য ঝামেলায় পড়ে যেতে পারে। তার থেকে বুদ্ধিমানের কাজ হবে সোজাসুজি সেই গোপন সুরঙ্গের আশেপাশে থেকে ডক্টর কাদেরকে ধরে ফেলা। জহুর তাই আর দেরি করল না, আবছা অন্ধকারে খোয়া ঢাকা পথে পা চালিয়ে সমুদ্রের তীরের দিকে ছুটে চলল।

অন্ধকারে জায়গাটা চিনতে একটু সমস্যা হচ্ছিল কিন্তু মোটামুটি অনুমান করে জহুর শেষ পর্যন্ত ঠিক জায়গায় এসে উপস্থিত হলো। স্পিডবোটের কাছাকাছি একটা গাছের আড়ালে সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতে কোনো ধরনের একটা অস্ত্র থাকলে ভালো হতো কিন্তু সে রকম কিছু না পেয়ে জহুর একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নেয়। তার ধারণা সত্যি হলে কোনো একটা গোপন দরজা খুলে ডক্টর কাদের বের হয়ে এখন এদিকে এগিয়ে আসবে।

জহুর দ্বীপের মাঝখানে হাসপাতালের ভেতর অনেক মানুষের কথাবার্তা শুনতে পায়। পুলিশের হুইসেল বুটের শব্দ এবং হঠাৎ হঠাৎ গুলির আওয়াজ। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে জহুর যখন আশা প্রায় ছেড়ে দিচ্ছিল তখন হঠাৎ করে বালুতে ঢেকে থাকা একটা দরজা সরিয়ে সেখান দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি বের হয়ে আসে। অন্ধকারে ভালো দেখা না গেলেও মানুষটি যে ডক্টর কাদের সেটা বুঝতে জহুরের একটুও দেরি হলো না। সে গাছের নিচে ঘাপটি মেরে বসে থেকে বোঝার চেষ্টা করে কী ঘটছে।

ডক্টর কাদের কয়েকটা ব্যাগ আর কাগজপত্রের প্যাকেট নিয়ে মাথা নিচু করে স্পিডবোটের কাছে এগিয়ে আসে। সেগুলো স্পিডবোটে তুলে

www.doridro.com

যখন সে দ্বিতীয়বার আরো কিছু জিনিস আনতে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন জহুর পেছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জহুরের ধাক্কায় ডক্টর কাদের মুখ থুবড়ে বালুর ওপর পড়ে যায়, জহুর এতটুকু দেরি না করে তার পিঠে চেপে বসে একটা হাত পেছনে টেনে আনে। ডক্টর কাদের যখন যন্ত্রণার একটা শব্দ করল তখন জহুর থেমে গিয়ে বলল, "আমার ধারণা আপনি এখন আর নড়াচড়া করবেন না। করে লাভ নেই।"

ডক্টর কাদের গোঙানোর মতো একটা শব্দ করল। জহুর ডক্টর কাদেরের কোমরে হাত দিয়ে উৎফুল্ল গলায় বলল, "চমৎকার। বেল্ট পরে এসেছেন। আপনার হাত বাঁধার জন্যে কিছু একটা খুঁজছিলাম।"

ডক্টর কাদের একটু ছটফট করার চেষ্টা করল, কিন্তু জহুর তাকে কোনো সুযোগ দিল না, শক্ত করে বালুর মাঝে চেপে রাখল। কোমর থেকে বেল্টটা খুলে সে তার হাত দুটো পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলে সন্তুষ্টির গলায় বলল, "হাতগুলো ব্যবহার করতে না পারলে দৌড়াদৌড়ি করা যায় না। আমার ধারণা এখন আপনি আর পালানোর চেষ্টা করবেন না।"

ডক্টর কাদের বালু থেকে মুখ সরিয়ে বলল, "আপনি কে?"

জহুর বলল, "আপনি আজ দুপুরে আমার ইন্টারভিউ নিলেন—চাকরি দিতে চাইলেন—"

"আমি জানি। আসলে আপনি কে?"

"আমি আসলে কেউ না। খুবই সাধারণ একজন মানুষ।"

ডক্টর কাদের মুখ থেকে বালু বের করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দেন, চলে যেতে দেন তাহলে যত টাকা চান তত টাকা দেব। আপনার সাথে আমি একটা ডিল করতে চাই—"

জহুর তার পকেট থেকে ময়লা একটা রুমাল বের করে ডক্টর কাদেরের চোখ দুটো বেঁধে ফেলে বলল, "এখন চোখ দুটোও বেঁধে ফেলেছি—হঠাৎ করে দৌড় দেয়ার ইচ্ছা থাকলেও সেটা করতে পারবেন না। রুমালটা একটু ময়লা সে জন্যে কিছু মনে করবেন না—"

ডক্টর কাদের কাতর গলায় বলল, "আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন। আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ, কেউ আমাকে শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারবে না—শুধু শুধু একটু ঝামেলা হবে। আপনি যদি আমাকে একটু সহযোগিতা করেন আপনারও লাভ, আমারও লাভ। আমি পেমেন্ট করব ডলারে। ক্যাশ। এক্ষুনি।"

www.doridro.com

জহুর ডক্টর কাদেরকে টেনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়া করিয়ে বলল, "আমি চাষাভূষো মানুষ। টাকা-পয়সা সে রকম নাই। কোনোদিন নিজের চোখে ডলারও দেখি নাই। সব সময় জানার ইচ্ছে ছিল একজন হারামির বাচ্চা আরেকজন হারামির বাচ্চাকে ঘুষ দেয়ার সময় কীভাবে সেটা দেয়। কীভাবে কথা বলে। আপনার কথা থেকে সেটা এখন বুঝতে পারলাম—কথাবার্তা হয় সোজাসুজি—"

ডক্টর কাদের বলল, "আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।"

জহুর পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "সেটা সত্যি কথা। মনে হয় বুঝতে পারছি না। আপনি বোঝান—দেখি বুঝি কি না। তবে হাঁটতে হাঁটতে বোঝান। যারা আপনাকে ধরতে এসেছে আপনাকে তাদের হাতে না দেয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। বলেন কী বলবেন—"

ডক্টর কাদের কোনো কথা বলল না, হঠাৎ করে সে বুঝতে পেরেছে তার কথা বলার কিছু নেই। তার চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধা তাই সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না—দেখতে পেলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না, তার ভবিষ্যৎটুকু এ রকম অন্ধকারই দেখা যেত।

ডক্টর কাদেরের অফিসে ডক্টর কাদেরের আরামদায়ক নরম চেয়ারেই ডক্টর কাদেরকে বসানো হয়েছে—শুধু একটা পার্থক্য, তার দুই হাতে এখন হ্যান্ডকাফ লাগানো। চোখ থেকে রুমালের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে, তার ঝকমকে চোখগুলো এখন নিষ্প্রভ। চোখের নিচে কালি, মাথার চুল এলোমেলো, চেহারায় একটা মলিন বিধ্বস্ত ভাব।

তার সামনে একটা চেয়ারে একজন তরুণ মিলিটারি অফিসার বসে আছে। সে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমি শুধু ডক্টর ম্যাঙ্গেলার নাম শুনেছিলাম, এখন নিজের চোখে ডক্টর কাদেরকে দেখতে পেলাম।" কথা বলার সময় সে "ডক্টর" শব্দটাতে অনাবশ্যক এক ধরনের জোর দিল।

জহুর ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়েছিল, ডক্টর কাদেরকে ধরে এনে দেয়ার জন্যে তাকে পুলিশ মিলিটারি অনেকটা নিজেদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করছে, ঘরের ভেতর থাকতে দিয়েছে। জহুরের খুব কৌতূহল হচ্ছিল ডক্টর ম্যাঙ্গেলা কে আর ডক্টর কাদেরের সাথে তার কী সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা জানার জন্যে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হচ্ছিল। জহুরের

www.doridro.com

অবশ্যি জিজ্ঞেস করতে হলো না, তরুণ অফিসার নিজেই তার ব্যাখ্যা দিয়ে দিল, বলল, "নাৎসি জার্মানিতে ডক্টর ম্যাঙ্গেলা জীবন্ত মানুষকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করত আর আপনি মানুষের জন্ম নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন। এই হচ্ছে পার্থক্য।"

ডক্টর কাদের কোনো কথা বলল না, পাথরের মতো মুখ করে বসে রইল। ডক্টর কাদেরের ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসে থাকা গুরুত্বপূর্ণ চেহারার সাধারণ পোশাকের মাঝবয়সী একজন মানুষ বলল, "আপনি কতজন মেয়ের ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট করেছেন?"

ডক্টর কাদের এবারেও কোনো কথা বলল না। মাঝবয়সী মানুষটি আবার জিজ্ঞেস করল, "কতজন মেয়ের ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট করেছেন?"

ডক্টর কাদের বিড়বিড় করে বলল, "আমি আমার এটর্নির সাথে কথা না বলে আপনাদের কথার কোনো উত্তর দেব না।"

তরুণ অফিসারটি এবারে শান্ত ভঙ্গিতে চেয়ার থেকে উঠে ডক্টর কাদেরের কাছে এগিয়ে গেল, তারপর খপ করে তার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে এনে ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে আমি মানুষ হিসেবে বিবেচনা করি না কাদের ডাক্তার। তোমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে আমার এক মিনিটও লাগবে না। তোমাকে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তার উত্তর দাও, তা না হলে এই টেবিলে আমি তোমার নাক-মুখ থেঁতলে ফেলব।"

মাঝবয়সী মানুষটি জিজ্ঞেস করল, "ডক্টর কাদের, আপনি কতজন মেয়ের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছেন?"

ডক্টর কাদের উত্তর না দিয়ে আবার বিড়বিড় করে অস্পষ্ট স্বরে কিছু একটা বলল, শুধু এটর্নি শব্দটা একটু বোঝা গেল। কথা শেষ হওয়ার আগেই তরুণ মিলিটারি অফিসার ডক্টর কাদেরের চুলের ঝুঁটি ধরে সশব্দে তার মুখটাকে টেবিলে আঘাত করল। যখন চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে তুলে আনল তখন দেখা গেল নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। মিলিটারি অফিসার আবার ফিসফিস করে বলল, "কাদের ডাক্তার, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। তোমাকে বিচার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আমার কোনো আনন্দ নেই। কিন্তু এই টেবিলে তোমার মুখটাকে থেঁতলে দিয়ে মাথার ঘিলু বের করে দিলে আমার আনন্দ আছে! মানুষ মারতে হয় না—কিন্তু দানবকে মারতে কোনো সমস্যা নাই। কথার উত্তর দাও।"

www.doridro.com

মাঝবয়সী মানুষটি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কতজন মেয়ের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছেন?"

"তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ।"

"কতজন মারা গেছে।"

"অর্ধেকের বেশি।"

"কতজন মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে?"

"বাকি অর্ধেক।"

"মেয়েগুলোকে কোথা থেকে এনেছেন?"

"পথঘাট থেকে। গরিবের মেয়ে।"

"আপনার এই প্রজেক্টে কে টাকা দিয়েছে?"

"আমেরিকার একটা জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি।"

"প্রজেক্টের উদ্দেশ্য কী?"

"নূতন ধরনের মানুষের জন্ম দেয়া। মানুষের জিনে পশু পাখির জিন মিশিয়ে দিয়ে নূতন ধরনের মানুষ তৈরি করা।"

মাঝবয়সী মানুষ নিঃশ্বাস আটকে রেখে জিজ্ঞেস করল, "এখন পর্যন্ত তৈরি হয়েছে কোনো নতুন ধরনের মানুষ?"

"পুরোপুরি হয়নি। বেশির ভাগ মেয়েই বিকলাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। জন্ম দিতে গিয়ে বেশির ভাগ মারা গেছে।"

"কী রকম বিকলাঙ্গ?"

ডক্টর কাদের কোনো কথা বলল না। মিলিটারি অফিসার ধমক দিয়ে বলল, "কী রকম বিকলাঙ্গ?"

"নাক চোখ মুখ নেই। হাত-পায়ের জায়গায় শুঁড়। তিন-চারটা চোখ। দুইটা মাথা। শরীরে আঁশ, এই রকম—"

ক্রুদ্ধ তরুণ অফিসারটি ডক্টর কাদেরের মাথাটি আবার সশব্দে টেবিলে এনে আঘাত করার চেষ্টা করছিল কিন্তু মধ্যবয়স্ক মানুষটি তাকে শেষ মুহূর্তে থামিয়ে দিল। তরুণ অফিসারটি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "খুন করে ফেলব। আমি এই বাস্টার্ডকে খুন করে ফেলব।"

মধ্যবয়সী মানুষটি বলল, "ঠিক আছে, আপনি খুন করবেন—কিন্তু আগে কয়েকটা কথা শুনে নিই।" তারপর আবার ডক্টর কাদেরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কেন এগুলো করেছেন?"

"শুধু আমি না, সারা পৃথিবীতে সব বৈজ্ঞানিকই এটা করে। এগুলো

www.doridro.com

এক্সপেরিমেন্ট। এক্সপেরিমেন্ট করে করে বৈজ্ঞানিকরা নূতন নূতন জিনিস জানে। আমার এই ল্যাবরেটরি থেকে অনেক নূতন জিনিস আমি জেনেছি।"

"যে জিনিস জেনেছেন সেগুলো কোনো জার্নালে ছাপা হয়েছে?"

ডক্টর কাদের কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "আমি জানি ছাপা হয় নাই। এগুলো জিনিস ছাপা হয় না। যে জ্ঞান দশজনের কাজে লাগে না সেটা বিজ্ঞান না। বিজ্ঞান মানুষকে নিয়ে এই রকম এক্সপেরিমেন্ট করে না। ডক্টর কাদের—আর যাই করেন আপনি মুখে বিজ্ঞানের কথা বলবেন না। বিজ্ঞানকে অপমান করবেন না।"

ডক্টর কাদের কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, তার নাক দিয়ে রক্ত বের হয়ে সারা মুখ মাখামাখি হয়ে গেছে। টেবিলে তার মাথাটা ঠুকে দেয়ার পর মনে হয় একটা দাঁতও নড়ে গেছে, মুখের ভেতর রক্ত, সব মিলিয়ে তাকে অত্যন্ত কদাকার দেখাচ্ছে। মধ্যবয়স্ক মানুষটি একটা নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, "এখন এই হাসপাতালে যে মেয়েগুলো আছে তাদের কী অবস্থা?"

"সবাই প্রেগনেন্ট। টেস্টটিউব বেবি।"

"সবার ফেটাসই জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে তৈরি?"

"হ্যাঁ।"

"কী রকম ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছে?"

"নানারকম। সরীসৃপের জিনস দেয়া আছে। বানর, কুকুর, ডলফিন। পাখি।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তার মানে সবগুলো মেয়ের অ্যাবোরশন করাতে হবে?"

ডক্টর কাদের নিচু গলায় বলল, "সবাইকে পারা যাবে না। কেউ কেউ এত অ্যাডভান্সড স্টেজে যে এখন অ্যাবোরশন করানো সম্ভব না।"

"তাদের বাচ্চাগুলো হবে পশু আর মানুষের মিশ্রণ?"

"হঁ্যা।"

"বাচ্চাগুলো বেঁচে থাকবে?"

"কেউ কম কেউ একটু বেশি।"

"তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়?"

ডক্টর কাদের মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ্।"

"মেয়েগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়?"

ডক্টর কাদের আবার মাথা নাড়ল, বলল, "বিকলাঙ্গ আধা পশু আধা

www.doridro.com

মানুষের বাচ্চা পেটে ধরে বেশির ভাগই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। বেঁচে থাকাই তাদের জন্যে এক ধরনের কষ্ট। তাই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি না।"

তরুণ মিলিটারি অফিসার আবার এগিয়ে এসে কেউ বাধা দেয়ার আগেই ডক্টর কাদেরের মাথার চুল ধরে তার মাথাটি সশব্দে টেবিলে এনে আঘাত করে। ডক্টর কাদের গোঙানোর মতো একটা শব্দ করল। যখন তার মাথাটি উঁচু করা হলো তখন দেখা গেল তার নাকটা থেঁতলে গেছে, সম্ভবত নাকের হাড়টা ভেঙে গেছে। ডক্টর কাদের থুথু ফেলার চেষ্টা করে এবং সেই থুথুর সাথে একটা ভাঙ্গা দাঁত বের হয়ে আসে। ভাঙা দাঁতটির দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ডক্টর কাদের বিড়বিড় করে বলল, "আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমি একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। আমার গায়ে হাত দেয়া যায় না। কেউ আমার গায়ে হাত দিতে পারে না।"

কেউ কিছু বলার আগেই তরুণ অফিসারটি ডক্টর কাদেরের চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে তুলে তাকে একটা লাথি দিয়ে নিচে ফেলে দেয়। এগিয়ে গিয়ে তাকে আরেকটা লাথি মারার আগে অন্যেরা তাকে থামিয়ে দিল। ডক্টর কাদেরের মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত বের হয়ে আসে, সে ঠিক এই অবস্থায় ঘোলা চোখে হাসার চেষ্টা করে বলল, "তুমি আমার কিছু করতে পারবে না। আমি হচ্ছি বিধাতার মতো। দ্বিতীয় বিধাতা। সারা পৃথিবীতে শুধু আমি নূতন ধরনের মানুষের জন্ম দিয়েছি। শুধু আমি।"

জহুর এগিয়ে গেল, ডক্টর কাদেরের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, "তিনশ তেত্রিশ নম্বর কেবিনের মেয়েটির পেটেও কি এ রকম কোনো বাচ্চা আছে?"

"আছে।"

"কী রকম বাচ্চা?"

"পাখি আর মানুষের বাচ্চা।"

"পাখি আর মানুষ?"

"হ্যাঁ। পাখি আর মানুষ।"

জহুর আরো একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটা কি বাঁচবে?"

"জানি না।"

"বাচ্চাটা?"

ডক্টর কাদের তার থ্যাঁতলানো মুখ, ভাঙা নাক এবং রক্তাক্ত মুখে হাসার

www.doridro.com

চেষ্টা করে বলল, "জানি না। যদি বাঁচে সে হবে প্রথম ইকারাস।"

জহুর ঠিক বুঝতে পারল না, জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন?"

"বলেছি ইকারাস।"

"ইকারাস কী?"

ডক্টর কাদের তার রক্তাক্ত মুখে অসুস্থ মানুষের মতো হাসার চেষ্টা করল, কোনো উত্তর দিল না।

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "ইকারাস হচ্ছে গ্রিক মাইথোলজির একটা চরিত্র। পাখির পালক লাগিয়ে সূর্যের কাছাকাছি উড়ে গিয়েছিল।"

www.doridro.com

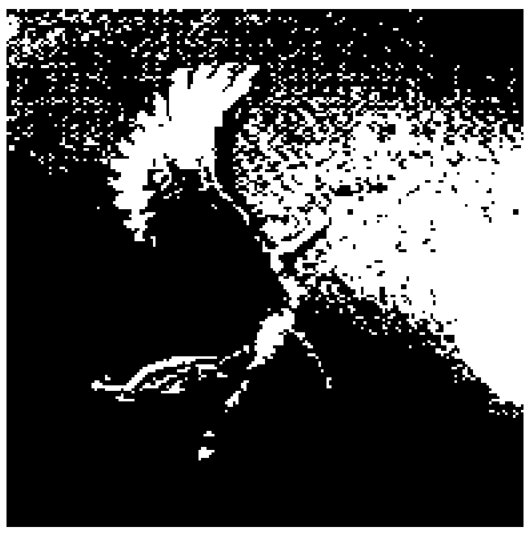

জাহাজের ডেকে মেয়েগুলো শুয়ে-বসে আছে। তারা কাছাকাছি থাকলেও কেউ কারো সাথে কথা বলছে না, হাঁটুর ওপর মুখ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দুই একজন রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। খুব ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে, এই আলোতে সমুদ্রটিকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়।

জহুর তিনশ তেত্রিশ নম্বর কেবিনের মেয়েটিকে খুঁজে বের করল–সেও রেলিংয়ে কনুই রেখে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির চেহারায় এক ধরনের গভীর বিষাদের চিত্র, ঠিক কী কারণে জানা নেই তাকে দেখলেই জহুরের বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

জাহাজের কর্কশ ভেঁপু বেজে ওঠে এবং প্রায় সাথে সাথেই তার ইঞ্জিনগুলো চালু হয়ে যায়, জহুর ডেকে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনের মৃদু কম্পনটুকু অনুভব করল। ঘরঘর শব্দ করে জেটি থেকে সিঁড়িটা সরিয়ে নেয়া হয়, সেনাবাহিনীর একজন মানুষ মোটা দড়ির বাঁধন খুলে জাহাজটিকে মুক্ত করে দেয়। জাহাজের প্রপেলার পেছনে পানির একটা প্রবল ঢেউয়ের জন্ম দিয়ে নড়ে উঠল।

তিনশ তেত্রিশ নম্বর কেবিনের মেয়েটি হঠাৎ করে কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে, সে সতর্ক দৃষ্টিতে এদিকে সেদিকে তাকালো, তারপর খুব শান্তভাবে ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে যায়।

জহুর একটু অবাক হয়ে মেয়েটির পেছনে পেছনে এগিয়ে যায়। মেয়েটি সবার চোখ এড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকে—আলাদা করে কেউ তাকে লক্ষ করল না। জহুর একটু দ্রুত পা চালিয়ে তার কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করল কিন্তু মেয়েটি দ্রুত নিচে নেমে ইঞ্জিন ঘরের পাশে দিয়ে জাহাজের পেছনে পৌঁছে গেল। এখানে রেলিং নেই এবং জায়গাটা বেশ বিপজ্জনক। কেউ অসতর্ক হলে পেছনে পানির প্রবল আলোড়নের

www.doridro.com

ভেতর মুহূর্তের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। জায়গাটি নির্জন, মেয়েটি সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে—ভোররাতের আবছা আলোতে দৃশ্যটিকে জহুরের কাছে কেমন জানি পরাবাস্তব মনে হতে থাকে।

জহুর পায়ে পায়ে মেয়েটির কাছে এগিয়ে যেতে থাকে–হঠাৎ করে তার মাথায় একটা ভয়ঙ্কর চিন্তার কথা উঁকি দিতে শুরু করেছে।

জাহাজটা খুব ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে, একই সাথে গতি সঞ্চয় করতে শুরু করেছে, জেটি থেকে এটা এর মাঝে বেশ খানিকটা সরে এসেছে। মেয়েটি একবার উপরে আকাশের দিকে তাকালো, দুই হাত বুকের কাছে নিয়ে এলো তারপর কিছু বোঝার আগেই সে হঠাৎ করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জহুর একটা চিৎকার করে সামনে ছুটে গেল কিন্তু ইঞ্জিনঘরের বিকট শব্দে কেউ তার চিৎকারটি শুনতে পেল না। জহুর জাহাজের শেষে ছুটে গিয়ে পানির দিকে তাকালো, ঘোলা পানির আবর্তনে মেয়েটির শরীরটা এক মুহূর্তের জন্যে ভেসে উঠে আবার পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে যায়। জহুর একবার পানির দিকে তাকালো একবার জাহাজটির দিকে তাকালো, সে ছুটে গিয়ে কাউকে বলে জাহাজটি থামাতে থামাতে এই হতভাগা মেয়েটি পানিতে ডুবে যাবে। জহুর ঠান্ডা মাথার মানুষ, কখনোই সে বিচলিত হয় না, আজকেও হলো না। মেয়েটাকে বাঁচাতে হলে কিছু একটা করতে হবে, তারপরেও তাকে বাঁচানো যাবে কি না কেউ জানে না। কিন্তু কিছু করা না হলে মেয়েটি নিশ্চিতভাবেই মারা যাবে তাই জহুর এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজটি তখন বেগ সঞ্চয় করে সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে, সেখানে কেউ জানতেও পারল না এখান থেকে দুজন মানুষ পর পর সমুদ্রের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একজন আত্মহত্যা করতে, অন্যজন তাকে উদ্ধার করতে।

জহুর পানির প্রবল আলোড়নের ভেতর থেকে বের হয়ে দ্রুত সাঁতার কেটে সামনে এগিয়ে যায়, মেয়েটিকে বাঁচাতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কাছে পৌঁছাতে হবে। পানি থেকে মাথা বের করে সে একবার চারপাশে দেখার চেষ্টা করল, পানির ঢেউ ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পেল না। জহুর পানিতে ডুব দিয়ে দ্রুত আরেকটু সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার মাথা তুলে তাকালো—কেউ কোথাও নেই। জহুর আরো একটু এগিয়ে আবার মাথা তুলে তাকালো। এবারে হঠাৎ করে তার মনে হলো বাম দিকে পানির ভেতর সে খানিকটা আলোড়ন দেখতে পেয়েছে। সেটি সত্যিই মেয়েটি কি না বা

DORIDRO.COM

www.doridro.com

এটি চোখের ভুল কি না জহুর সেটি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল—সে দুই হাত নেড়ে অদৃশ্য কিছু খুঁজতে থাকে এবং হঠাৎ করে তার হাত একজন মানুষের শরীর স্পর্শ করে। জহুর সাথে সাথে তাকে জাপটে ধরে পানির ওপর টেনে আনে। মেয়েটির শরীর নেতিয়ে আছে, জহুর তাকে তুলে ধরে তার মুখের দিকে তাকালো, চোখ দুটো বন্ধ এবং মুখে প্রাণের চিহ্ন নেই। জহুর সেটা নিয়ে মাথা ঘামালো না, মেয়েটাকে চিৎ করে ভাসিয়ে তীরের দিকে সাঁতরাতে থাকে।

সমুদ্রের তীরে এসে সে মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে এনে বালুবেলায় শুইয়ে দেয়। মেয়েটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে কি না ভালো করে বোঝা গেল না, জহুর তার মাথাটা একটু ঘুরিয়ে দেয়, যেন নিঃশ্বাস নেয়া সহজ হয়। তারপর তাকে ধরে একটা ছোট ঝাঁকুনি দিল, ঠিক তখন মেয়েটি খকখক করে কেশে নড়ে ওঠে। জহুর মেয়েটাকে একটু সোজা করে বসিয়ে দেয়, কাশতে কাশতে মেয়েটা বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে চোখ খুলে তাকালো, তাকিয়ে জহুরকে দেখে সে একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে। জহুর জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই মেয়ে।"

মেয়েটা তীব্র দৃষ্টিতে জহুরের দিকে তাকিয়ে থেকে কাশতে কাশতে বলল, "আমাকে কেন তুলে এনেছ?"

জহুর মুখে হাসি ধরে রেখে বলল, "কেন আনব না? একজন মানুষ পানিতে ডুবে মারা যাবে আর আমি সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব, সেটা তো হতে পারে না।"

মেয়েটা চোখ বন্ধ করে বলল, "আমাকে মরে যেতে হবে। আমাকে এক্ষুনি মরে যেতে হবে।"

"কেন?"

"আমার পেটের ভেতরে একটা রাক্ষস। কিলবিল কিলবিল করছে বের হওয়ার জন্যে। বের হয়ে সে সবাইকে মেরে ফেলবে। সে বের হবার আগে আমাকে মরে যেতে হবে যেন সে বের হতে না পারে।"

জহুর কী বলবে ঠিক বুঝতে পারল না, ইতস্তত করে বলল, "তুমি এসব কী বলছ?"

"আমি সত্যি বলছি। পারুলের পেটে একটা বাচ্চা ছিল তার অর্ধেকটা মানুষ অর্ধেকটা সাপের মতো। রাহেলার পেটে একটা রাক্ষস ছিল তার দুইটা মাথা এত বড় বড় দাঁত। বিলকিসের পেটের বাচ্চাটার ছিল লম্বা লম্বা শুঁড়।

www.doridro.com

আমার পেটের বাচ্চাটা শকুনের মতো—"

"ছি! তুমি কী বলছ এসব। তোমাদের নিয়ে চিকিৎসা করে সবকিছু ঠিক করে দেবে।"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "আমাদের কেমন করে চিকিৎসা করবে? আমাদের বিয়ে হয়নি পেটে বাচ্চা এসেছে, আমরা সব হচ্ছি শয়তানি। আমরা সব রাক্ষুসী। আমরা সব—"

মেয়েটা হঠাৎ বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো কাঁদতে শুরু করে। জহুর কী করবে ঠিক বুঝতে পারে না। সে বহুদিন নরম গলায় কারো সাথে কথা বলেনি, কোমল গলায় কাউকে সান্ত্বনা দেয়নি। কেমন করে দিতে হয় সে ভুলেই গেছে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে মেয়েটার মাথার হাত বুলিয়ে বলল, "দেখবে তুমি সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"হবে না। হবে না। হবে না—"

"হবে।" জহুর জোর গলায় বলল, "আমার একটা মেয়ে ছিল তোমার মতোন, তাকে আমি বাঁচাতে পারি নাই। বেঁচে থাকলে সে এখন তোমার বয়সী হতো। তুমি আমার সেই মেয়ের মতোন, আমি তোমাকে আমার মেয়ের মতোন রাখব।"

মেয়েটি হঠাৎ ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করে। জহুর কী করবে বুঝতে না পেরে মেয়েটাকে শক্ত করে ধরে রাখল।

মেয়েটি হাসপাতালের ভেতর ঢুকতে রাজি হয়নি বলে জহুর তাকে নারকেল গাছের নিচে একটা বিছানা করে দিল। শুকনো কাপড় পরিয়ে একটা কম্বল দিয়ে তাকে বুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে, সে শক্ত করে কম্বলটা ধরে উদভ্রান্তের মতো সামনে কোথায় জানি তাকিয়ে রইল। জহুর মেয়েটার কাছে চুপচাপ বসে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে, হঠাৎ করে মেয়েটি কেন জানি চুপ করে গেছে।

জহুর বলল, "মানুষের জীবনে আসলে অনেক দুঃখ-কষ্ট আসে। ধৈর্য ধরে সেইগুলো সহ্য করতে হয়। যদি মানুষ সেটা সহ্য করে তাহলে দেখবে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়।"

মেয়েটা জহুরের কথা শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না সে একদৃষ্টে বহুদূরে তাকিয়ে রইল। জহুর বলল, "তুমি একটু বিশ্রাম নাও। এই দ্বীপটাতে এখন কেউ নাই, শুধু তুমি আর আমি। একটু পরে নিশ্চয়ই কেউ

www.doridro.com

আসবে তখন আমরা যাব। তোমার কোনো ভয় নাই। বড় বড় ডাক্তারেরা তোমাকে দেখবে। তোমার চিকিৎসা হবে। "

মেয়েটা এবারেও কোনো কথা বলল না। জহুর বলল, "তুমি যদি আমাকে তোমার বাড়ির ঠিকানা দাও তাহলে আমি তোমার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিতে পারি, তারা এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।" একটু থেমে যোগ করল, "এখন যদি তাদের কাছে যেতে না চাও তুমি ইচ্ছা করলে আমার সাথেও থাকতে পার। আমার সংসার ঘর বাড়ি কিছু নাই, তুমি হবে আমার মেয়ে। আমার সাথে তুমি থাকবে—"

মেয়েটা হঠাৎ যন্ত্রণার মতো একটা শব্দ করল। জহুর চমকে তার দিকে তাকায়, মেয়েটার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে আছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, সে বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। জহুর তার হাত ধরে বলল, 'কী হয়েছে?"

মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, "আমি মরে যাচ্ছি।"

"কেন তুমি মরে যাবে?"

"ব্যথা।" মেয়েটা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল, "ভয়ানক ব্যথা।"

"কোথায় ব্যথা?"

"পেটে।"

"ব্যথাটা কী আসছে যাচ্ছে?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল। জহুর জিজ্ঞেস করল, "একটু পরে পরে আসছে? আস্তে আস্তে ব্যথাটা বাড়ছে?"

মেয়েটা আবার মাথা নাড়ল।

জহুর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এই মেয়েটি এখন তার পেটে ধরে রাখা সন্তানটি জন্ম দিতে যাচ্ছে। ডক্টর কাদের তার ভয়ঙ্কর গবেষণা করে এই অসহায় মেয়েটির পেটে যে হতভাগ্য একটা শিশুর জন্ম দিয়েছে সেই শিশুটি এখন পৃথিবীতে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। মানুষের জন্ম প্রক্রিয়াটি সহজ নয়, এর মাঝে কষ্ট আছে, যন্ত্রণা আছে এবং মনে হয় খানিকটা বিপদের আশঙ্কাও আছে। সন্তান জন্ম হওয়ার পর সন্তানটিকে দেখে সেই দুঃখ-কষ্ট আর বিপদের কথা মায়েরা ভুলে যায়। এই মেয়েটির বেলায় সেই কথাটি সত্যি নয়। এই মেয়েটি কষ্ট আর যন্ত্রণার মাঝে দিয়ে যাবে। তারপর যে শিশুটির জন্ম নেবে তাকে দেখে তার কষ্ট আর যন্ত্রণা সে ভুলতে পারবে না। সবচেয়ে ভয়ের কথা, এই মেয়েটি এখন যে বিকলাঙ্গ

www.doridro.com

এবং ভয়াবহ শিশুটির জন্ম দেবে তাকে জন্ম দিতে সাহায্য করার জন্য কোনো ডাক্তার দূরে থাকুক একজন ধাত্রীও নেই। এমন কি একজন মহিলা পর্যন্ত নেই। মেয়েটি কীভাবে তার সন্তানের জন্ম দেবে জহুর জানে না। জন্মানোর পর সেই বিকলাঙ্গ শিশুটিকে নিয়ে সে কী করবে? সেই শিশুটিকে দেখে এই মেয়েটির কী প্রতিক্রিয়া হবে?

জহুর তার মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করে দিল। সন্তান জন্ম দেয়ার সময় কী কী করতে হয় তার কিছু জানা নেই। যদি সত্যি সত্যি একটা মানব শিশু জন্ম নিত তাহলে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কিছু ব্যাপার করার দরকার হতো, নাড়ি কাটতে হতো, গরম কাপড়ে জড়িয়ে রাখতে হতো, খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হতো। কিন্তু এখন সেসব কিছু নিয়ে তার মাথা ঘামাতে হবে না। বিকলাঙ্গ একটা মাংসপিণ্ড জন্ম দেয়ার পর মেয়েটিকে সুস্থ রাখাই হবে তার একমাত্র দায়িত্ব। তখন কী করতে হবে সে কিছু জানে না, কিন্তু মানুষ অত্যন্ত বিচিত্র একটা প্রাণী, কখন কী করতে হয় না জানলেও তারা সেটা কীভাবে কীভাবে জানি বের করে ফেলতে পারে। জহুর সেটা বের করে ফেলবে।

জহুর মেয়েটির কাছে গিয়ে তার হাতটি ধরল। হাতটি শীতল এবং ঘামে ভেজা, জহুর বুঝতে পারে হাতটি থরথর করে কাঁপছে। সে নরম গলায় বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই, মা।"

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, "আমি মারা যাচ্ছি।"

"তুমি মোটেই মারা যাচ্ছ না। তুমি তোমার শরীরে যে বাচ্চাটা আছে তার জন্ম দিতে যাচ্ছ।"

মেয়েটা দাঁতে দাঁত কামড়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে থাকে। তার সারা শরীর ঘামে ভিজে ওঠে। জহুর মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে দুই দিন আগেও এই মেয়েটার কথা জানত না, এই মেয়েটাকে চিনত না। সে এখনো এই মেয়েটির নাম পর্যন্ত জানে না, অথচ এই দুর্ভাগা মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুকের ভেতর গভীর বেদনা অনুভব করছে। তার ইচ্ছে করছে তার সকল যন্ত্রণা সকল কষ্ট নিয়ে নিতে—সেটি সম্ভব নয়, তাই সে মেয়েটির হাত শক্ত করে ধরে রাখল।

নবজাতক একটা শিশুর তীক্ষ্ণ কান্না কানে যেতেই মেয়েটি দুই হাতে তার মুখ ঢেকে বলল, "সরিয়ে নিয়ে যাও। এই রাক্ষসটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও।"

www.doridro.com

রক্ত এবং ক্লেদে মাখা শিশুটার দিকে জহুর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। ফুটফুটে ফুলের মতো অনিন্দ্য সুন্দর একটা শিশু, মাথায় রেশমের মতো চুল, বড় বড় চোখ, টিকালো নাক, ছোট ছোট হাত-পা। উপুড় হয়ে রক্ত এবং ক্লেদে পড়েছিল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পিঠে দুটো ছোট ছোট পাখা। হাত এবং পায়ের সাথে সাথে তার পাখাগুলো তিরতির করে নড়ছে। জহুর এগিয়ে গিয়ে শিশুটিকে তুলে নেয়—শিশুটি পাখির পালকের মতো হালকা।

মেয়েটি মুখ ঢেকে চিৎকার করে বলল, "সরিয়ে নাও। সরিয়ে নাও!"

জহুর তার শার্টটা খুলে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে নেয়, তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখো! দেখো বাচ্চাটাকে। কী সুন্দর!"

মেয়েটি খুব ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে তাকালো এবং এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে অনিন্দ্য সুন্দরা শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর খুব সাবধানে শিশুটির হাতটা স্পর্শ করে বলল, "সব কিছু ঠিক আছে?"

"হ্যা আছে।"

"আঙুলগুলি?"

জহুর ঠিক বুঝতে পারল না এই মেয়েটি শিশুটির সবকিছু ভুলে শুধু আঙুলগুলোর কথা কেন জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু সে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না, বলল, "হ্যাঁ। ঠিক আছে।"

মনে হলো আঙুলগুলো ঠিক আছে শুনেই মেয়েটির সব দুশ্চিন্তার যেন অবসান হয়ে গেল। সে চোখ বন্ধ করে আছে এবং এই প্রথমবার তার মুখে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে ওঠে। জহুর ঠিক বুঝতে পারল না এই শিশুটির পিঠে ছোট দুটি পাখা আছে সেটি এখন তাকে বলবে কি না—কী ভেবে শেষ পর্যন্ত জহুর সেটি বলল না। জহুর লক্ষ করল মেয়েটি ফিসফিস করে কিছু বলছে, জহুর নিচু হয়ে তার মুখের কাছে তার মাথাটি নামিয়ে আনে, শুনতে পায় মেয়েটি ফিসফিস করে বলছে, "আমি মারা যাচ্ছি। তুমি আমার ছেলেটিকে দেখে রেখো?"

জহুর বলল, "না। তুমি মারা যাবে না। তুমি বেঁচে থাকবে।"

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, "আমি মারা যাচ্ছি।"

সত্যি সত্যি মেয়েটি মারা গেল সূর্য ডোবার আগে। পাখির পালকের মতো হালকা শিশুটাকে বুকে জড়িয়ে রেখে জহুর মেয়েটার মাথার কাছে বসে রইল।

হঠাৎ করে সে আবিষ্কার করল, মেয়েটার নামটি তার জানা হয়নি।

www.doridro.com

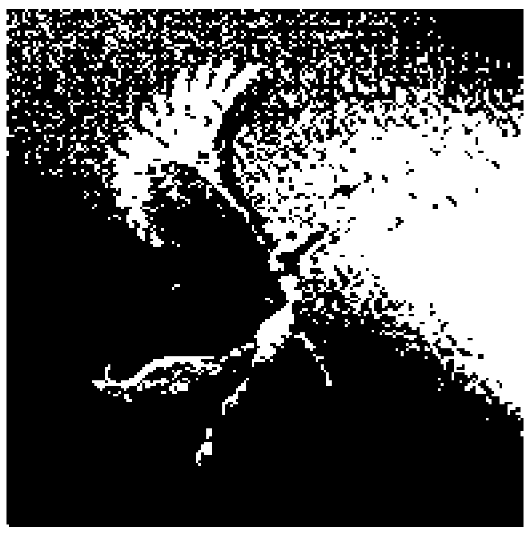

ডক্টর সেলিম বিস্ফারিত চোখে কেবিনেটে উপুড় করে রাখা শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট বাচ্চাটি তার মাথাটি উঁচু করার চেষ্টা করছে, ঘাড় এখনো শক্ত হয়নি তাই মাথাটা অল্প অল্প দুলছে। একটা হাতে নিজেকে ভর দিয়ে রেখেছে, অন্য হাতটা নিজের মুখে। ছোট মুখে তার হাতটা ঢোকানো সম্ভব নয়, বাচ্চাটি সেটা জানে না, সে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে। তার বড় বড় চোখ, সে সামনে তাকিয়ে আছে কিন্তু আলাদা করে কিছু একটা দেখছে বলে মনে হয় না।

ডক্টর সেলিম অবশ্যি ছোট শিশুটির এসব কিছুই দেখছিল না, সে হতবাক হয়ে বাচ্চাটির পিঠের দিকে তাকিয়ে ছিল, সেখানে ছোট ছোট দুটি পাখা এবং পাখাগুলো মাঝে মাঝে নড়ছে। ডক্টর সেলিম সাবধানে একটা পাখাকে স্পর্শ করতেই পাখাটা একটা ছোট ঝাপটা দিল এবং ডক্টর সেলিম সাথে সাথে তার হাত সরিয়ে নিল। সে ঝুঁকে পড়ে পিঠের ঠিক যেখান থেকে পাখাটা বের হয়ে এসেছে সে জায়গাটুকু লক্ষ করল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা কার বাচ্চা? কোথা থেকে এসেছে?"

"বাচ্চার দায়িত্ব কার, সেটা যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলা যায় দায়িত্ব আমার।"

"বাচ্চাটার পাখা কোথা থেকে এসেছে?"

জহুর জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "সেইটা অনেক বড় ইতিহাস।"

"ইতিহাসটা কী? বাচ্চাটা কার? বাবা-মা কে?"

"বাবা নাই। টেস্টটিউব বেবি না কী বলে সেইটা—আপনারা ভালো বুঝবেন। আর মা—"

www.doridro.com

"মা?"

"মা মারা গেছে। বাচ্চাটা জন্ম দেয়ার পরই মারা গেছে। মারা যাওয়ার সময় আমার হাত ধরে আমাকে বাচ্চাটা দিয়ে গেছে। বলেছে দেখে শুনে রাখতে। বলেছে—"

শিশুটির মা মৃত্যুর ঠিক আগে জহুরকে কী বলে গেছে ডক্টর সেলিম সেটা শুনতে কোনো আগ্রহ দেখাল না, জিজ্ঞেস করল, "এই বাচ্চাটাকে দেখে ডাক্তাররা কী বলেছে?"

জহুর বলল, "কোনো ডাক্তার বাচ্চাটারে দেখে নাই। আপনি প্রথম।"

ডক্টর সেলিম কেমন যেন চমকে উঠল, বলল, "আমি প্রথম? এর আগে কেউ দেখে নাই?"

"না।"

"বাচ্চাটার যখন জন্ম হয়—"

"কেউ ছিল না। শুধু আমি।"

"শুধু আপনি? কেন?"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সেটা অনেক লম্বা ইতিহাস।"

ডক্টর সেলিমের লম্বা ইতিহাস শোনার ধৈর্য নেই, জিজ্ঞেস করল, "আমার আগে কোনো ডাক্তার এই বাচ্চাকে দেখে নাই?"

"শুধু ডাক্তার না, কোনো মানুষও দেখে নাই।"

ডক্টর সেলিমের চোখ দুটি চকচক করে ওঠে, "কোনো মানুষ দেখে নাই?"

"নাহ।" জহুর ইতস্তত করে বলল, "বুঝতেই পারছেন। এই বাচ্চাটাকে কেউ দেখলেই হইচই শুরু করে দেবে।"

ডক্টর সেলিম মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আর কাউকে না দেখিয়ে যে আমার কাছে এনেছেন সেটা ঠিকই করেছেন।"

জহুর বলল, "জি। আমি চাই না এটা জানাজানি হোক। যাই হোক আমি আপনার কাছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছি।"

"কী উদ্দেশ্য।"

জহুর বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি এর ডানা দুটি কেটে দিবেন।"

ডক্টর সেলিম একটু চমকে উঠল, "কেটে দিব?"

www.doridro.com

"জি স্যার। এর পাখা দুটি কেটে দিলে তাকে নিয়ে কেউ কোনো কথা বলবে না। তা না হলে এর জীবনটা অসহ্য হয়ে উঠবে।"

ডক্টর সেলিম সাবধানে বাচ্চাটার পাখাটা স্পর্শ করে জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। পাখা নিয়ে বড় হলে এর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।"

"এই অপারেশন করতে কত লাগবে আমাকে বলবেন? আমি খুব গরিব মানুষ, অনেক কষ্টে কিছু টাকার ব্যবস্থা করেছি।"

ডক্টর সেলিম বলল, "আরে! কী বলছেন আপনি। এই বাচ্চাটাকে ঠিক করে দেয়ার টাকা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন?"

জহুর ডক্টর সেলিমের মুখের দিকে তাকালো, হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল এই মানুষটি আসলে তার সাথে মিথ্যা কথা বলছে। বাচ্চাটার অপারেশন করা থেকে অন্য কিছুতে তার আগ্রহ বেশি। সাথে সাথে তার মুখ কঠিন হয়ে যায়। সে শীতল গলায় বলল, "ডাক্তার সাহেব।"

"বলেন।"

"আপনি আমাকে বলেন কত খরচ হবে। আমি তারপর অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যাব।"

ডক্টর সেলিম ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন? অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে কেন?"

"একটা বাচ্চার পিঠে পাখা থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার না, সেটা কয়েকজনকে দেখিয়ে ঠিক করা ভালো।"

ডক্টর সেলিম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন দরজায় শব্দ হলো, মেয়ের গলায় কেউ একজন বলল, "স্যার।"

ডক্টর সেলিম অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে একটা টাওয়েল দিয়ে বাচ্চাটার ঘাড় পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে বলল, "কে? নাসরীন?"

"জি স্যার।" ডক্টর সেলিম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে কম বয়সী একটা মেয়ে ডক্টর সেলিমের চেম্বারে ঢুকে গেল। তার শরীরে ডাক্তারের সবুজ রঙের অ্যাপ্রন, গলায় স্টেথিস্কোপ। চোখে চশমা, চেহারায় কেমন জানি এক ধরনের সজীবতা রয়েছে।

ডক্টর সেলিম বলল, "কী ব্যাপার?"

নাসরীন নামের ডাক্তার মেয়েটা বলল, "চার নম্বর কেবিনের বাচ্চাটা। আমার মনে হয় সার্জারি না করাটাই ঠিক হবে। যেহেতু ফিফটি ফিফটি চান্স,

www.doridro.com

ফেমিলির ওপর বার্ডেন না দেয়াই ভালো।"

ডক্টর সেলিম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে নাসরীন হঠাৎ করে ক্যাবিনেটে শুইয়ে রাখা বাচ্চাটাকে দেখে এবং সাথে সাথে তার মুখে মধুর এক ধরনের হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সে কাছে এগিয়ে বলে, "ও মা! কী সুন্দর বাচ্চাটা! একেবারে পরীর মতোন চেহারা!"

ডক্টর সেলিম হাত দিয়ে নাসরীনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কাছে যেয়ো না।"

নাসরীন অবাক হয়ে বলল, "কেন স্যার?"

ডক্টর সেলিম আমতা আমতা করে বলল, 'এটা স্পেশাল কেস। এটার জন্যে বিশেষ একটা ব্যবস্থা দরকার।"

নাসরীন জহুরের দিকে তাকালো, জিজ্ঞেস করল, "স্পেশাল কেস? কী হয়েছে?"

জহুর মেয়েটির মুখের দিকে তাকায় এবং হঠাৎ করে কেমন যেন আশ্বস্ত অনুভব করে। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপা। আপনিও দেখেন।"

ডক্টর সেলিম জহুরকে থামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু জহুর তাকে ঠেলে সরিয়ে কাছে গিয়ে বাচ্চাটার উপর থেকে টাওয়েলটা সরিয়ে নেয়।

নাসরীন বাচ্চাটাকে দেখে বিস্ময়ে একটা চিৎকার করে ওঠে। অনেকক্ষণ সে দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে রাখে, তারপর কাছে গিয়ে প্রথমে তাকে আলতোভাবে স্পর্শ করে, তারপর সাবধানে তাকে কোলে তুলে নেয়। বাচ্চাটি নাসরীনকে দেখে তার দাঁতহীন মুখে একটা হাসি দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার চশমাটা ধরার চেষ্টা করল।

কয়েক মুহূর্ত নাসরীন কোনো কথা বলতে পারল না, তারপর একটু চেষ্টা করে বলল, "একেবারে পাখির পালকের মতো হালকা!"

জহুর মাথা নাড়ল, "কি আপা। একেবারে হালকা, কিন্তু বাচ্চাটা অনেক শক্ত।"

"এটা কার বাচ্চা?"

জহুর বলল, "সেটা অনেক লম্বা ইতিহাস।"

নাসরীনের ইতিহাসটা শোনার কৌতূহলের অভাব নেই, জিজ্ঞেস করল, "কী ইতিহাস শুনি। বলেন।"

ডক্টর সেলিম এই বারে বাধা দিল, বলল, "নাসরীন, তুমি বাচ্চাটাকে ক্যাবিনেটে রেখে দাও। আর খবরদার এর কথা কাউকে বলবে না। কাউকে

www.doridro.com

না। নেভার।"

নাসরীন সাবধানে বাচ্চাটাকে ক্যাবিনেটে রেখে বলল, "ঠিক আছে স্যার বলব না। কিন্তু স্যার এটা কেমন করে সম্ভব?"

"সেটা আমি এখনো জানি না, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ এটা সম্ভব।"

জহুর নাসরীনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপা। আপনিও তো ডাক্তার। তাই না?

"হ্যাঁ। আমিও ডাক্তার তবে খুবই ছোট ডাক্তার। মাত্র পাস করেছি।" সে ডক্টর সেলিমকে দেখিয়ে বলল, "স্যার আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় ডাক্তার। ডাক্তারদেরও ডাক্তার। "

জহুর কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে বড় ডাক্তারের চেয়ে এই ছোট ডাক্তারের মাঝে এক ধরনের ভরসা খুঁজে পেল। সে নিচু গলায় বলল, "আপা। এই বাচ্চাটার ডানা দুটি আমি অপারেশন করে কাটতে চাই—"

নাসরীন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি আমাদের কাছে এনেছেন, যেটা তার জন্যে ভালো হয় সেটাই করা হবে।"

জহুর সাথে সাথে কেমন করে জানি বুঝতে পারল এই মেয়েটি যে কথাগুলো বলছে সেটা সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেই বলছে। সে এবারে ঘুরে নাসরীনের দিকে তাকালো, বলল, "আপা আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি। এই ছেলেটার জন্যে এই পাখা দুইটা কেটে ফেলা ছাড়া আর কোনো গতি নাই। যদি তার পাখা থাকে সে হবে একটা চিড়িয়া। যেই তাকে দেখবে সেই তাকে ধরে সার্কাসে বিক্রি করে দেবার চেষ্টা করবে—"

নাসরীন মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এ রকম একটা বাচ্চা এত আশ্চর্য যে সায়েন্টিফিক কমিউনিটি যখন জানবে তখন একেবারে পাগল হয়ে যাবে!

"পাগল হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"পাগল হয়ে কী করবে?"

"দেখতে চাইবে। বুঝতে চাইবে।"

"কেমন করে দেখতে চাইবে?"

নাসরীন বলল, "সেটা আমি ঠিক জানি না। বৈজ্ঞানিকদের সবকিছু নিয়ে কৌতূহল থাকে।"

জহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আপা, বৈজ্ঞানিকরা যেন এই

www.doridro.com

বাচ্চার খোঁজ না পায়।"

"কেন?"

"বাচ্চার মা আমার হাত ধরে দায়িত্বটা দিয়ে গেছে। মারা যাবার ঠিক আগে আমাকে বলেছে—"

জহুর একটু আগেই ঘটনাটা ডক্টর সেলিমকে বলার চেষ্টা করেছিল সে শুনতে কোনো আগ্রহ দেখায়নি, নাসরীন খুব আগ্রহ নিয়ে শুনল এবং শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, "শুনে আমার খুবই খারাপ লাগছে, বেচারি এত কম বয়সে এত বড় কষ্টের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। আহারে!"

জহুর বলল, "আমি চাই না বাচ্চাটাও কষ্টের ভেতর দিয়ে যাক। সেই জন্যে বড় হবার আগেই তার পাখা দুটি কেটে ফেলতে চাই।"

নাসরীন একবার ডক্টর সেলিমের দিকে তাকালো তারপর ইতস্তত করে বলল, "আপনার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু আমরা তো এত ছোট বাচ্চার ওপর হঠাৎ করে এ রকম একটা অপারেশন করে ফেলতে পারি না। কিছু করার আগে এর এনাটমিটা বুঝতে হবে। মানুষের শরীরে কোথায় কী আমরা জানি—কোন গুরুত্বপূর্ণ আর্টারি কোন দিক দিয়ে গিয়েছে সেটা আমাদের শিখানো হয়। কিন্তু এই বাচ্চাটা তো অন্য রকম, কোনো রকম স্টাডি না করে চট করে পাখা দুটি তো কেটে ফেলতে পারি না।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে। সেটা আমি বুঝতে পারছি। আপনি তাহলে একটু দেখেন, দেখে বলেন—"

ডক্টর সেলিম এবারে আলোচনায় যোগ দেয়ার চেষ্টা করল, বলল, "আমিও তো আপনাকে সেটাই বলছিলাম। আমরা একটু স্টাডি করে দেখি।"

জহুর ডক্টর সেলিমের দৃষ্টি এড়িয়ে নাসরীনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কতক্ষণ লাগবে বলতে?"

নাসরীন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ডক্টর সেলিম বাধা দিয়ে বলল, "এক সপ্তাহ তো মিনিমাম।"

"উহুঁ।" জহুর মাথা নাড়ল, "এই বাচ্চাকে এক সপ্তাহ হাসপাতালে রাখার ক্ষমতা আমার নাই—"

"সেটা নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না। এইটা আমাদের নিজস্ব হাসপাতাল, আমরা কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেব। আপনি বাচ্চাটাকে রেখে যান, এক সপ্তাহ পরে আসেন।"

জহুর ডক্টর সেলিমের দিকে তাকিয়ে তার কথাটি শুনল, কিন্তু উত্তর

www.doridro.com

দিল নাসরীনের দিকে তাকিয়ে, বলল, "আপা। এই বাচ্চাটার তো মা নাই, আমি বুকে ধরে মানুষ করেছি। আমি তো তারে এক সপ্তাহের জন্যে রেখে যেতে পারব না।"

নাসরীন বলল, "ছোট বাচ্চাদের বেলায় আমরা মা'দের সাথে থাকতে দেই। এই বাচ্চাটার জন্যে আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে থাকতে দেব।"

ডক্টর সেলিম বাধা দিয়ে বলল, "না—না—না সেটা এখনই বলা যাবে না। আমাদের স্টাডি করতে সময় নেবে, সব সময় আপনি থাকতে পারবেন না। এটা খুবই আনয়ুজুয়াল কেস।"

জহুর এবার এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাটিকে কাপড়ে জড়িয়ে কোলে তুলে নিতে থাকে, ডক্টর সেলিম অবাক হয়ে বলল, "কী করছেন? আপনি কী করছেন?"

"আমি এই বাচ্চাকে এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখের আড়াল করব না। আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে যাচ্ছি। অন্য কোথাও যাব।"

ডক্টর সেলিম বলল, "দাঁড়ান। দাঁড়ান আগেই এত ব্যস্ত হবেন না। দেখি আমরা কী করা যায়।"

জহুর নাসরীনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপা। আপনি যদি বলেন তাহলে আমি থাকব, তা না হলে আমি আমার এই বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাব।"

নাসরীন একটু অবাক হয়ে একবার ডক্টর সেলিমের দিকে আরেকবার জহুরের দিকে তাকালো, তারপর ইতস্তত করে বলল, "আমি খুব জুনিয়র ডাক্তার। এই স্যারের আন্ডারে কাজ করি, কাজ শিখি। আমার কথার কোনো গুরুত্ব নাই, আপনাকে এই স্যারের কথা বিশ্বাস করতে হবে।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "আমি খুব গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ। কে কী করে আমি জানি না। আমি মানুষের মুখের কথায় বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত নেই। আপা, আপনি আমাকে যদি বলেন আমি থাকব, তা না হলে আমি চলে যাব।"

ডক্টর সেলিম জহুরকে বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে–আপনি পাঁচ মিনিট এই ঘরে বসেন। আমি নাসরীনের সাথে দুই মিনিট কথা বলে আসছি।"

ডক্টর সেলিম নাসরীনকে একরকম জোর করে পাশের ঘরে নিয়ে গেল, তার চোখে-মুখে উত্তেজনা, বড় বড় করে নিঃশ্বাস পড়ছে, নাসরীনের হাত ধরে চাপা গলায় বলল, "নাসরীন।"

www.doridro.com

"জি স্যার।"

"তুমি নিশ্চয়ই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ।"

"জি স্যার।"

"এই বাচ্চাটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাইজ। একে আমাদের দরকার। যে কোনো মূল্যে।"

নাসরীন ভুরু কুঁচকে বলল, "যে কোনো মূল্যে?"

"হ্যাঁ। কোনো একটা কারণে এই মানুষটা আমাকে বিশ্বাস করছে না কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করছে। বুঝেছ?"

"জি স্যার।"

"কাজেই তুমি তাকে বোঝাও। শান্ত কর, যেন বাচ্চাটাকে নিয়ে না যায়। আমার দুই ঘণ্টা সময় দরকার।"

"দুই ঘণ্টা!"

"হ্যাঁ।"

নাসরীন ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু স্যার—"

ডক্টর সেলিম অধৈর্য গলায় বলল, "এর মাঝে কোনো কিন্তু নাই। তুমি যাও, মানুষটার সাথে কথা বল, তাকে আশ্বস্ত কর। আমি এর মাঝে ব্যবস্থা করছি।"

"কী ব্যবস্থা?"

"সেটা তোমার জানার দরকার নেই। তুমি যাও।"

নাসরীন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ডক্টর সেলিম তাকে সেই সুযোগ দিল না। একরকম ধাক্কা দিয়ে তার চেম্বারে পাঠিয়ে দিল।

চেম্বারের মাঝামাঝি জহুর বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার মুখ পাথরের মতো কঠিন। নাসরীনকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলল, "আপা।"

"জি।"

"আমি কি বাচ্চাটাকে নিয়ে থাকব নাকি চলে যাব?"

নাসরীন ইতস্তত করে বলল, "এই বাচ্চাটাকে নিয়ে দশ জায়গায় যাওয়া হয়তো ঠিক হবে না। যত কম মানুষ এই বাচ্চাটার কথা জানে তত ভালো। আপনি যখন এখানে এসেছেন মনে হয় আপাতত এখানেই থাকেন। এটা একটা খুব সম্ভ্রান্ত হাসপাতাল, বড় বড় মানুষেরা থাকেন। তারা মিলে সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারবেন।"

জহুর নাসরীনের চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল,

www.doridro.com

"ঠিক আছে আপা। আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করে থাকলাম।"

ঠিক কী কারণে জানা নেই, নাসরীন নিজের ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তার মনে হতে থাকে কোনো একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, যেটা সঠিক নয়—সেটা কী হতে পারে সে ঠিক বুঝতে পারছিল না।

ঘণ্টা দুয়েক পরে নাসরীন অবশ্যি ব্যাপারটা বুঝতে পারল। একটা পুলিশের গাড়ি হাসপাতালের পাশে এসে দাঁড়াল এবং গুরুত্বপূর্ণ চেহারার কয়েকজন মানুষ ডক্টর সেলিমের সাথে এসে দেখা করল। তারা অফিসে কিছুক্ষণ নিচু গলায় কথা বলল, তারপর সবাই মিলে ডক্টর সেলিমের চেম্বারে হাজির হলো। বাচ্চাটি অনেকক্ষণ নিজে নিজে খেলা করে এখন উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে গেছে—ঘুমানোর ভঙ্গিটা একটু বিচিত্র, পেছন দিকটা উঁচু দুই পা গুটিশুটি হয়ে আছে। মুখে বিচিত্র একটা হাসি, পিঠের পাখা দুটি মাঝে মাঝে নড়ছে। ডক্টর সেলিম বাচ্চাটিকে এক নজর দেখে জহুরের দিকে তাকালো, বলল, "আমরা আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি।"

জহুর মানুষগুলোর দিকে তাকালো, নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়েই সে ব্যাপারটা বুঝে যায়। সে ক্লান্ত গলায় বলল, "কী কথা।"

ডক্টর সেলিম মুখটা অনাবশ্যকভাবে কঠিন করে বলল, "এই বাচ্চাটাকে আপনাকে আমাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে।"

"কেন?"

"এটি আপনার বাচ্চা না। এই বাচ্চার উপরে আপনার কোনো আইনগত অধিকার নেই। শুধু তাই না—আপনি বাচ্চাটির পাখা কেটে ফেলতে গেছেন, সেটা অমানবিক। আপনি এই বাচ্চাটির প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে চাইছেন।"

জহুর শীতল চোখে কিছুক্ষণ ডক্টর সেলিমের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, "এই বাচ্চাটির মা আমাকে এই বাচ্চাটা দিয়ে গেছে। দিয়ে বলেছে দেখে-শুনে রাখতে—"

ডক্টর সেলিম এবারে হাসার মতো এক ধরনের শব্দ করল, বলল, "আপনি কয়েকবার এই কথাটা বলেছেন। আমার মনে হয় এটার তদন্ত হওয়া দরকার। এর মায়ের মৃত্যু কেমন করে হয়েছে? সেটা কি স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল? তাকে কি খুন করা হয়েছিল? ডেথ সার্টিফিকেট কোথায়? তাকে

www.doridro.com

কোথায় কবর দেয়া হয়েছে? এসব প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। এর যে কোনো একটি প্রশ্ন করা হলেই আপনি কিন্তু বড় ঝামেলায় পড়ে যাবেন।"

জহুর শীতল গলায় বলল, "আপনি প্রশ্ন করেন। দেখি আমি ঝামেলায় পড়ি কি না।"

ডক্টর সেলিম জহুরের দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "সেই প্রশ্ন তো আমি করব না। করবে পুলিশ—"

"কোথায় পুলিশ?"

গুরুত্বপূর্ণ চেহারার একজন মানুষ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ডক্টর সেলিম তাকে সুযোগ না দিয়ে বলল, "আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমি চেষ্টা করছি আপনাকে যেন পুলিশের সাথে ঝামেলায় পড়তে না হয়। এই বাচ্চাটা আপনার কেউ নয়। ঘটনাক্রমে বাচ্চাটা আপনার হাতে এসে পড়েছে–আপনার পক্ষে এর দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। প্রফেশনালদের এর দায়িত্ব নিতে হবে। আপনি প্রফেশনাল নন, এই বাচ্চাটির কখন কী প্রয়োজন হবে আপনি জানেন না। আমরা জানি। শুধু আমরাই পারি এর দায়িত্ব নিতে।"

জহুর কোনো কথা না বলে শীতল চোখে ডক্টর সেলিমের দিকে তাকিয়ে রইল। ডক্টর সেলিম আবার তার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। অকারণেই কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে বলে, "বাচ্চাটার কোনো সমস্যা আছে কি না কেউ জানে না। একে ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার। যদি শরীরে জটিল সমস্যা থাকে তাহলে চিকিৎসা করা দরকার। আপনি এত বড় দায়িত্ব কেমন করে নেবেন? আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, এই বাচ্চাটার দায়িত্ব আমরা নিতে চাই।"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনারা কি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবেন?"

ডক্টর সেলিম চমকে উঠল, থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করল, "মেরে ফেলব? মেরে ফেলব কেন?"

"এই বাচ্চাটার পাখা কেন আছে সেটা বোঝার জন্যে তাকে কেটে কুটে দেখতে হবে না? কেটে কুটে দেখার জন্যে তাকে আগে মেরে ফেলতে হবে না?"

ডক্টর সেলিম থতমত খেয়ে বলল, "এটা আপনি কেন বলছেন? আমি আপনার এ রকম একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য না।"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে।"

www.doridro.com

"আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা চাই আপনি কোনো রকম ঝামেলা না করে চলে যান। বাচ্চাটার ব্যাপারটা আমরা দেখব।"

জহুর উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে তাকালো, নাসরীনের মুখের দিকে সে কয়েক সেকেন্ড বেশি তাকিয়ে রইল, নাসরীন চোখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, "আমি দুঃখিত। কিন্তু আসলে মানে আসলে—" সে বাক্যটা শেষ না করে থেমে যায়।

জহুর ক্যাবিনেটে পেছনটা উঁচু করে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকা বাচ্চাটার কাছে যায়, মাথা নিচু করে বাচ্চাটার দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর মাথা ঘুরিয়ে বলল, "আমি অনেক কষ্ট করে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে তুলেছি। আসলে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে না তুললেই ভালো হতো। তার মায়ের পাশে তাকে কবর দিতে পারতাম। আপনাদের মতো শকুনেরা তাহলে তার শরীরটাকে খুবলে খুবলে খেতে পারত না।"

বড় বড় শক্তিশালী দুজন মানুষ কোথা থেকে এসে তখন জহুরের দুই হাত ধরে তাকে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে থাকে। জহুর যেতে চাচ্ছিল না কিন্তু মানুষ দুজন তাকে জোর করে টেনে নিতে থাকে। দরজার কাছে জহুর একবার দাঁড়িয়ে গেল, পেছনে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "খোদা আপনাদের মাফ করবে কি না জানি না, আমি কোনোদিন আপনাদের মাফ করব না।"

জহুরকে বের করে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ডক্টর সেলিম চুপ করে বসে রইল, তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সবার দিকে ঘুরে তাকালো, মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "সবাইকে থ্যাংকস। কোনো ঝামেলা ছাড়াই ব্যাপারটা শেষ হয়েছে। যে রকম গোঁয়াড় ধরনের মানুষ আমি ভেবেছিলাম কী না কী করে।"

গুরুত্বপূর্ণ চেহারার একজন মানুষ বলল, "কিছু করতে পারত না, আমি সঙ্গে অনেক আর্মড গার্ড এনেছি।"

"আমি জানি। আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি একা এটা করতে পারতাম কি না জানি না। যাই হোক আপনারা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার অংশ হয়ে থাকলেন। এই বাচ্চাটার অস্তিত্ব পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক কমিউনিটিতে একটা ঝড় তুলবে। একটা নূতন দিগন্ত তৈরি হবে। আপনারা দোয়া করবেন আমরা যেন তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে পারি।"

উপস্থিত যারা ছিল তাদের কেউ কোনো কথা বলল না, শুধু গম্ভীরভাবে কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল।

www.doridro.com

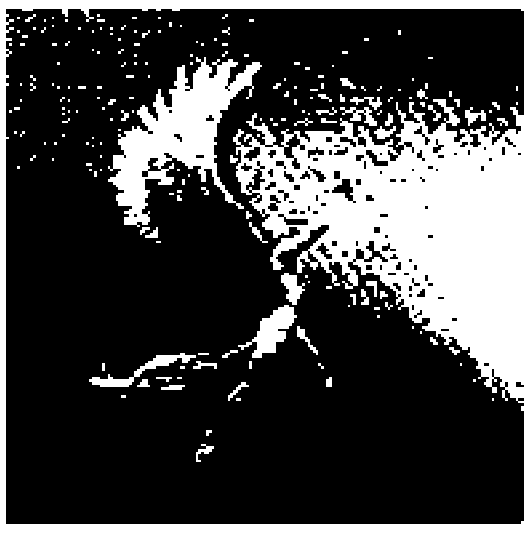

ছোট বাচ্চাটা চিৎকার করে কাঁদছে কিন্তু কাউকেই সেটা নিয়ে বিচলিত হতে দেখা গেল না। বাচ্চাটার সারা শরীরে নানা ধরনের মনিটর লাগিয়ে তাকে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হয়েছে, নানারকম যন্ত্রপাতিতে তার শরীরের সব ধরনের জৈবিক কাজকর্মের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। কয়েকটা ভিডিও ক্যামেরা তার দিকে তাক করে রাখা হয়েছে। এর মাঝে তাকে নানা দিক থেকে এক্সরে করা হয়েছে, আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার জন্যে প্রস্তুতি চলছে।

বাচ্চার কান্নাটি ধীরে ধীরে নাসরীনের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। সে টেকনিশিয়ানকে বলল, "বাচ্চাটার মনে হয় খিদে লেগেছে।"

"কার?"

"এই বাচ্চাটার।"

টেকনিশিয়ানের মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে, বলে "বাচ্চা? কোথায় বাচ্চা?"

নাসরীন অবাক হয়ে বলল, "এই যে।"

টেকনিশিয়ান হা হা করে হেসে বলল, "এইটা? এইটা তো মানুষের বাচ্চা না। এইটা শয়তানের বাচ্চা। মানুষের বাচ্চার কখনো পাখা থাকে?"

নাসরীন অবাক হয়ে টেকনিশিয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকল, কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। ইতস্তত করে বলল, "শয়তানের বাচ্চা হলেও তো বাচ্চা। একটা বাচ্চার খিদে লাগে।"

"হ্যাঁ খিদে তো লাগেই। কিন্তু শয়তানের বাচ্চা কী খায় তা তো জানি না। কী খেতে দেব? রক্ত?" টেকনিশিয়ানটি হা হা করে হাসতে লাগল যেন খুব একটা মজার কথা বলেছে।

নাসরীন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘর থেকে বের হয়ে ডক্টর সেলিমের চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায়। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখে ডক্টর সেলিম টেলিফোনে কার সাথে যেন কথা বলছে। কথাগুলো বলছে ইংরেজিতে।

www.doridro.com

কাজেই মনে হয় অন্য পাশে দেশের বাইরের কোনো মানুষ।

নাসরীন শুনল ডক্টর সেলিম বলছে, "তুমি ভিডিও ফুটেজটা দেখেছ? কী মনে হয়?"

অন্য পাশ থেকে কী বলেছে নাসরীন শুনতে পেল না কিন্তু ডক্টর সেলিমের হা হা হাসি শুনে বুঝতে পারল কথাটি নিশ্চয়ই খুব মজার। ডক্টর সেলিম বলল, "তাহলে তুমি আমার এই শয়তানের বাচ্চার একটা টুকরো চাও?... কোন টুকরা...?... উঁহু। তুমি সবকিছুর এক টুকরা পাবে না। যে কোনো একটা জায়গার একটা টুকরো। হয় ফুসফুসের একটা টুকরো, তা না হয় হৃৎপিণ্ডের, না হয় মস্তিষ্কের, না হয় লিভার কিংবা রক্তের স্যাম্পল—বল তুমি কী চাও?"

নাসরীনের মনে হলো হড়হড় করে সে বমি করে দেবে, কোনোমতে মুখ ঢেকে সে নিঃশব্দে বের হয়ে আসে। লাউঞ্জের একটা চেয়ারে সে কিছুক্ষণ নিজের মাথা চেপে বসে থাকে। যে মানুষটি এই বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিল সে তাহলে ঠিকই অনুমান করেছে যে বাচ্চাটিকে এরা মেরে ফেলবে। এ রকম ফুটফুটে বাচ্চাকে কেমন করে মানুষ মেরে ফেলতে পারে? কেমন করে তাকে শয়তানের বাচ্চা বলতে পারে?

নাসরীন হঠাৎ করে বুঝতে পারে তার হাতগুলো থরথর করে কাঁপছে। মানুষটি এই বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল, নাসরীনের কথা বিশ্বাস করে রেখে গেছে। নাসরীন যদি না বলত তাহলে মানুষটা এই বাচ্চাটাকে নিয়ে যেত, বাচ্চাটা বেঁচে যেত। তার কথা বিশ্বাস করে মানুষটা বাচ্চাটাকে নিয়ে থেকে গিয়েছিল। এই ছোট শিশুটাকে হত্যা করার জন্যে যদি একটা মানুষ দায়ী হয়ে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে সে নিজে। নাসরীন তার হাতের দিকে তাকায়, তার মনে হতে থাকে তার হাতে বুঝি ছোপ ছোপ রক্ত।

নাসরীন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, তার মুখ শক্ত হয়ে যায়। সে একজন ডাক্তার, মানুষকে বাঁচানোর জন্যে সে শপথ নিয়েছে, মানুষকে হত্যা করার জন্যে নয়। যেভাবে হোক তার বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে। নাসরীন লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার আই.সি. ইউনিটের দিকে উঁকি দিল, একটু আগেই বাচ্চাটা চিৎকার করে কাঁদছিল এখন নেতিয়ে ঘুমিয়ে আছে। নাসরীন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছে কেন?"

"ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছি। চিৎকার করে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছিল। ফুসফুসে কী জোর বাবারে বাবা।"

DORIDRO.COM

www.doridro.com

"ইনজেকশন? কীসের ইনজেকশন?"

"ঘুম। কিছুক্ষণ ঘুমাক শয়তানের বাচ্চা। আমরা একটু খেয়ে আসি।"

মানুষগুলো বের হওয়ার সাথে সাথে নাসরীনের হঠাৎ মনে হলো বাচ্চাটাকে বাঁচানোর সে একটা সুযোগ পেয়েছে। দৈব সুযোগ। শুধু সেই পারবে বাচ্চাটাকে এখান থেকে বের করতে। সে বিছানার কাছে ছুটে গেল, বাচ্চাটার শরীরে লাগানো নানা ধরনের মনিটরগুলো খোলার আগে সে অ্যালার্মগুলো বিকল করে দিল। বাচ্চাটা পাখির পালকের মতো হালকা, একটা বালিশের ওয়ার খুলে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে সে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে উপরে তার অ্যাপ্রনটা পরে নেয়। কেউ যদি সন্দেহ করে তাকে সার্চ করে শুধু তাহলেই বাচ্চাটাকে পাবে। নাসরীন আই.সি.ইউ থেকে বের হয়ে করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে। লিফটের কাছে এসে বোতাম টিপে সে অপেক্ষা করে—নাসরীনের মনে হয় লিফটটা আসতে বুঝি কয়েক যুগ সময় লেগে যাচ্ছে। ছোট বাচ্চাকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ করে উঠে চিৎকার করে কাঁদা শুরু করার সম্ভাবনা নেই, তবু তার বুক ধ্বক ধ্বক করতে থাকে।

লিফট আসার পর ভেতর থেকে কয়েকজন বের হয়ে এলো, নাসরীন তখন সাবধানে লিফটের এক কোনায় গিয়ে দাঁড়ায়। ভেতরে কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়েছিল, ভাগ্যিস তাদের মাঝে পরিচিত কেউ নেই।

লিফটটা বিভিন্ন তলায় থামতে থামতে নিচে এসে দাঁড়াল। নাসরীন নিঃশব্দে নেমে আসে, গেটে কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। নাসরীন তাদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় বের হয়ে এলো। বাচ্চাটাকে বের করে এখন কোলে নিতে হবে, তারপর একটা রিক্সা কিংবা স্কুটারে করে যেতে হবে—কোথায় যেতে হবে সে এখনো জানে না।

ঠিক তখন নাসরীনের চোখ পড়ল হাসপাতালের গেটের কাছে গুটিশুটি মেরে বসে থাকা মানুষটির দিকে। জহুর সেখানে চুপচাপ বসে আছে, কেন বসে আছে কে জানে। নাসরীন একটু এগিয়ে গেল, বলল, "আপনি?"

জহুর মাথা নাড়ল। ফিসফিস করে বলল, "মেরে ফেলেছে?"

নাসরীন মাথা নাড়ল, "না।"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মেয়েটা আমাকে বাচ্চাটার দায়িত্ব দিয়েছিল। আমি পারলাম না। আমার নিজের ভুলের জন্যে।"

"কী ভুল?"

www.doridro.com

"আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম—ভেবেছিলাম—"

নাসরীন একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আমি আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছি। আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছি।"

জহুরের একটু সময় লাগল কথাটা বুঝতে। যখন বুঝতে পারল তখন সে উঠে দাঁড়াল, খুব ধীরে ধীরে তার মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে, সে হাসতে অভ্যস্ত নয়, তার মুখে হাসিটাকে অত্যন্ত বেমানান মনে হয়। জহুর হাত বাড়িয়ে বলল, "কোথায়?"

নাসরীন হাতের পাশ থেকে ঝোলানো বালিশের ওয়ারে রাখা ছোট বাচ্চাটাকে বের করে দিল, বলল, "ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। এখন উঠবে না—আপনি যত দূর সম্ভব নিয়ে যান, দেরি করবেন না।"

"না দেরি করব না।" জহুর বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে নাসরীনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে কী বলবে সে বুঝতে পারছে না, অনুভূতির নরম কোমল কথাগুলো সে বলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সেটাই সে বলল, "আমি আসলে কী বলব বুঝতে পারছি না।"

নাসরীন বলল, "কিছু বলতে হবে না। আপনি যান। যত তাড়াতাড়ি পারেন যান।"

"আপনার হয়তো ঝামেলা হবে—"

"হলে হবে। আপনি যান।"

"যাচ্ছি।"

নাসরীন দেখল, জহুর বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে মানুষের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডক্টর সেলিমকে কেমন যেন উদভ্রান্তের মতো দেখায়, সে কাঁপা গলায় বলল, "তুমি কী করেছ?"

"আমি বাচ্চাটাকে সেই মানুষটার কাছে দিয়ে দিয়েছি।"

মনে হলো ডক্টর সেলিম কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না, কয়েকবার তার ঠোঁট নড়ল, কোনো শব্দ বের হলো না। একটু চেষ্টা করে বলল, "বাচ্চাটাকে দিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আপনারা যেন বাচ্চাটাকে খুন করে না ফেলেন সে জন্যে।"

www.doridro.com

"তুমি জান তুমি কী করেছ? তুমি জান?"

নাসরীন মাথা নাড়ল, বলল, "জানি। মানুষটা আমার কথা বিশ্বাস করে বাচ্চাটাকে রেখে গিয়েছিল, আমি তার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছি।"

ডক্টর সেলিম হঠাৎ উন্মাদের মতো চিৎকার করে নাসরীনের দিকে এগিয়ে এলো, বলল, "আমি তোমাকে খুন করে ফেলব। খুন করে ফেলব।"

নাসরীন কষ্ট করে একটু হাসল, বলল, "করতে চাইলে করেন স্যার। কিন্তু সেই বাচ্চাটাকে খুন করতে পারবেন না।"

"বাচ্চা? কিসের বাচ্চা? ওইটা কি মানুষের বাচ্চা ছিল?"

"জি স্যার। মানুষের বাচ্চা ছিল।"

"না। এটা ছিল পাখির বাচ্চা—পাখি! মানুষের বাচ্চাকে খুন করা যায় না—কিন্তু পাখির বাচ্চাকে দরকার হলে—কেটে কুটে দেখা যায়। বুঝেছ?"

"না স্যার বুঝিনি!"

"শুনে রাখো মেয়ে। ঐ পাখির বাচ্চাটাকে আমি খুঁজে বের করব। করবই করব। আর তোমাকে—"

"আমাকে স্যার?"

"আমি দেখব তুমি কীভাবে তোমার ক্যারিয়ার তৈরি কর। এই দেশের মাটিতে তোমাকে আমি থাকতে দিব না।"

নাসরীন তার দুই হাত সামনে মেলে ধরে বলল, "দেখেন স্যার।"

"কী দেখব?"

"আমার হাত! পরিষ্কার। একটু আগে মনে হচ্ছিল এখানে ছোপ ছোপ রক্ত! এখন আর নাই। আমার ক্যারিয়ারের দরকার নাই স্যার, আমি মানুষের বাসায় বাসন ধুয়ে জীবন কাটিয়ে দেব। কিন্তু রাত্রে যখন ঘুমাতে যাব দেখব আমার হাত ধবধবে পরিষ্কার। সেখান এক ফোঁটা রক্ত নাই।"

ডক্টর সেলিম চিৎকার করে বলল, "বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। এই হাসপাতালে আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।"

নাসরীন বলল, "আপনি আমার মুখ দেখবেন না স্যার। আর কোনো দিন দেখবেন না। তার মানে বুঝতে পারছেন তো?"

"কী মানে?"

"আপনার মুখটাও আমার আর কোনো দিন দেখতে হবে না!"

হাতে একটা কুপি বাতি নিয়ে আনোয়ারা ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল,

www.doridro.com

"ঘরের ভেতরে কে? জহুর নাকি?"

জহুর বলল, "হ্যাঁ। আনোয়ারা বুবু? তুমি?"

"হ্যাঁ জহুর। তুমি হঠাৎ করে কোথা থেকে এসেছ? সন্ধ্যেবেলা দেখি তোমার ঘরে আলো, ভাবলাম কে আবার ঘরে বাতি দেয়। তোমাকে দেখব ভাবি নাই।"

"আমিও ভাবি নাই। বস আনোয়ারা বুবু। বসার কিছু নাই, মাটিতেই বস।"

জহুর বহুদিন পর নিজের ভিটেতে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে সন্ধ্যেবেলা ঘরে আলো জ্বালিয়েছে। আলো দেখে তার পাশের বাড়ির আনোয়ারা দেখতে এসেছে। আনোয়ারার সাথে জহুরের কোনো রক্তের সম্পর্ক নাই কিন্তু তার নিজের বোনের মতো।

আনোয়ারা কুপি বাতিটা মাটিতে রেখে দাওয়ায় হেলান দিয়ে বসে। আবছা অন্ধকারে সে জহুরকে একটু দেখার চেষ্টা করে। বিড়বিড় করে বলে, "বাপ দাদার ভিটার মাঝে শেয়াল কুকুর দৌড়ায়, ব্যাপারটা ঠিক না জহুর। তোমার ভাবসাব দেখে মনে হয় দুনিয়ায় যেন কারো বউ মরে না। ঝি মরে না।"

জহুর কোনো উত্তর দিল না। আনোয়ারা বিড়বিড় করে বলল, "এখন একটা বিয়ে করে সংসারী হও। ছেলেমেয়ে থাকলে তারা মৃত্যুর পরে দোয়া করে। গোর আজাব মাফ হয়।"

জহুর নিচু গলায় হাসার মতো একটা শব্দ করে বলল, "আনোয়ারা বুবু তোমার শরীরটা কেমন?"

আনোয়ারা একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করে বলল, "আমার আবার শরীর। এক পা কবরে এক পা মাটিতে। আজরাইল সবার দিকে নজর দেয়, আমার দিকে নজর দেয় না।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "না আনোয়ারা বুবু। আজরাইল এখন তোমার দিকে নজর দিলে হবে না। তোমার আরো কয় বৎসর বাঁচা লাগবে।"

"কেন? আমার বাঁচা লাগবে কেন?"

জহুর উঠে দাঁড়াল, ঘরের কোনায় মাচার ওপর শুইয়ে রাখা শিশুটাকে সাবধানে তুলে এনে আনোয়ারার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই বাচ্চাটাকে তোমার মানুষ করে দিতে হবে।"

www.doridro.com

আনোয়ারা বিস্ফারিত চোখে জহুরের দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, "এইটা কার বাচ্চা?"

"সেইটা অনেক লম্বা ইতিহাস আনোয়ারা বুবু।"

"এত ছোট বাচ্চা তুমি কোথায় পেয়েছ? বাবা কী করে? মা কী করে?"

"বাবা নাই, মা নাই। বাচ্চার মা'কে আমি নিজের হাতে কবর দিয়েছি।"

আনোয়ারা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই বাচ্চা দেখি পরীর মতোন সুন্দর। ছেলে না মেয়ে?"

"ছেলে।"

"তুমি পুরুষ মানুষ এত ছোট বাচ্চা নিয়ে আসছ কেন? এতিমখানায় রেখে আসলে না কেন? কত বড়লোকের পরিবার বাচ্চা নেয়—"

জহুর বলল, "সেইটা অনেক বড় ইতিহাস। তুমি বাচ্চাটাকে কোলে নাও তাহলে বুঝতে পারবে।"

"তাহলে কী বুঝতে পারব?"

"আগে একবার কোলে নাও তো।"

আনোয়ারা হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে, "ইয়া মাবুদ! বাচ্চার কোনো ওজন নাই!"

জহুর মাথা নাড়ে, "নাই আনোয়ারা বুবু। এর কোনো ওজন নাই।"

"কেন? ওজন নাই কেন?" আনোয়ারা বিস্ময় এবং আতঙ্ক নিয়ে শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

"তুমি বাচ্চাটার কাপড় খুলো, খুলে দেখো। পিঠের দিকে দেখো।"

আনোয়ারা সাবধানে পেঁচানো কাপড়টা খুলে বাচ্চাটার পিঠের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে, "ইয়া মাবুদ! এ তো জিনের বাচ্চা—"

জহুর হাসার চেষ্টা করল, বলল, "না আনোয়ারা বুবু। এইটা জিনের বাচ্চা না—"

আনোয়ারা বাচ্চাটাকে দুই হাতে ধরে আতঙ্কে কাঁপতে থাকে, "জিনের বাচ্চা! ইয়া মাবুদ! জিনের বাচ্চা!"

জহুর হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে নিজে কোলে নিয়ে বলল, "না আনোয়ারা বুবু, এইটা জিনের বাচ্চা না। এইটা মানুষেরই বাচ্চা। আমার সামনে এই বাচ্চার জন্ম হয়েছে। বাচ্চার মা'কে আমি নিজের হাতে কবর দিয়েছি।"

আনোয়ারা তখনো থরথর করে কাঁপছে। জহুর হাসার চেষ্টা করে

www.doridro.com

বলল, "ভয়ের কিছু নাই বুবু। এইটা মানুষের বাচ্চা। বাচ্চাটার পাখা আছে সেইটাই হচ্ছে বিপদ। শহরের ডাক্তার এই মাসুম বাচ্চাটাকে নিয়ে মেরে ফেলতে চায়। কেটে কুটে দেখতে চায়। অনেক কষ্টে উদ্ধার করে এনেছি আনোয়ারা বুবু।"

আনোয়ারা তখনো কোনো কথা বলল না, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। জহুর বলল, "আনোয়ারা বুবু, জন্মের আগে থেকেই এই বাচ্চাটা বিপদে। যেই দেখে সেই তারে কেটে কুটে ফেলতে চায়। এর মা আমার হাত ধরে বলেছে একে বাঁচিয়ে রাখতে। সেই জন্যে চেষ্টা করছি!"

আনোয়ারা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এইটা আসলেই মানুষের বাচ্চা?"

"হ্যাঁ। শহরের মানুষজনের হাত থেকে অনেক কষ্ট করে বাঁচিয়ে এনেছি। এই চরে মানুষজন কম, এইখানে একে বড় করতে হবে। আনোয়ারা বুবু তুমি বাচ্চাটাকে একটু বড় করে দাও।"

আনোয়ারা আবার ভয়ে ভয়ে বাচ্চাটার দিকে তাকালো। বাচ্চাটা তখন হঠাৎ ফিক করে হেসে দেয়, দাঁতহীন মাড়ির সেই হাসি দেখে খুব ধীরে ধীরে আনোয়ারার মুখেও হাসি ফুটে ওঠে। ফিসফিস করে বলল, "বাচ্চাটার হাসি কত সুন্দর।"

জহুর বলল, "শুধু হাসি না আনোয়ারা বুবু, এই বাচ্চার সবকিছু সুন্দর। শুধু একটা জিনিস সুন্দর না। সেইটা হচ্ছে কপাল।"

আনোয়ারা আবার হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নেয়, নিজের গালের সাথে তার গাল স্পর্শ করে বলল, "এই বাচ্চাটার কোনো নাম আছে?"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "আমি তাকে বুলবুলি ডাকি। বুলবুলি পাখির মতোন শরীর সেই জন্যে নাম বুলবুল।"

"বুলবুল?"

"হ্যাঁ।"

আনোয়ারা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। বুলবুল নামটা সুন্দর। তোমার কী মনে হয় জহুর? এই বাচ্চা কি একদিন আকাশে উড়বে?"

"জানি না আনোয়ারা বুবু। আমি কিছুই জানি না।"

আনোয়ারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বুলবুল নামের পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বাচ্চাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

www.doridro.com

দ্বিতীয় পর্ব

আনোয়ারা বলল, "সোজা হয়ে দাঁড়া দুষ্টু ছেলে। নড়বি না।"

বুলবুল সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। সে তার দুই হাত তুলে দুই দিকে ছড়িয়ে রেখেছে, আনোয়ারা পুরানো কাপড় দিয়ে তার শরীরটাকে পেঁচিয়ে দিচ্ছে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আনোয়ারা পুরানো কাপড় দিয়ে তার শরীরটা পেঁচিয়ে দেয়। বুলবুলের পিঠে পাখাগুলো বড় হয়ে উঠছে, সেটা যেন কেউ বুঝতে না পারে সে জন্যে কাপড় দিয়ে সেটা তার শরীরের সাথে পেঁচিয়ে রাখা হয়। কাপড় দিয়ে পাখাগুলো শরীরের সাথে পেঁচানোর পরও পিঠের দিকে খানিকটা উঁচু হয়ে থাকে দেখে মনে হয় একটা কুঁজ ঠেলে উঠেছে। আনোয়ারা বুলবুলকে একটা শার্ট পরিয়ে দিয়ে বলে, "মনে আছে তো সবকিছু?"

"আছে খালা।" বুলবুল অধৈর্য হয়ে বলল, "মনে থাকবে না কেন?"

আনোয়ারা বলল, "আমি জানি তোর মনে আছে। তারপরেও তোকে মনে করিয়ে দিই। কারো সাথে ঝগড়া করবি না, মারামারি করবি না। পানিতে নামবি না। গা থেকে শার্ট খুলবি না।"

"হ্যাঁ খালা, মনে আছে। ঝগড়া করবি না, মারামারি করবি না, পানিতে নামবি না, শার্ট খুলবি না!"

আনোয়ারা বলল, "তোর যে পাখা আছে সেইটা কেউ জানে না। জানলে বিপদ হবে।"

বুলবুলকে হঠাৎ একটু বিভ্রান্ত দেখায়। সেই ছোটবেলা থেকে বুলবুল জানে সে অন্য রকম। তার পাখা আছে—কিন্তু সেটা কাউকে বলা যাবে না। সেটা লুকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু কেন সেটা কাউকে বলা যাবে না, কেন সেটা লুকিয়ে রাখতে হবে সে জানে না। কখনো কাউকে জিজ্ঞেস করেনি।

www.doridro.com

আজকে জিজ্ঞেস করল, "কেন খালা? আমার পিঠে পাখা আছে, সেটা কেন কাউকে বলা যাবে না?"

আনোয়ারা কী উত্তর দেবে বুঝতে পারে না। ইতস্তত করে বলল, "তুই কি আর কোনো মানুষের পিঠে পাখা দেখেছিস?"

"না। দেখি নাই।"

"তাহলে? যারাই দেখবে তোর পাখা আছে তারা অবাক হবে তোকে নিয়ে টানাটানি করবে।"

"কেন টানাটানি করবে।"

"এইটা মানুষের নিয়ম। যেটা অন্য রকম সেইটা নিয়ে মানুষ টানাটানি করে।"

বুলবুল বলল, "ও।" ব্যাপারটা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল না কিন্তু সেটা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইল না। বলল, "খালা। আমার খুব রাগ লাগে যখন সবাই আমাকে কুঁজা ডাকে।"

"ডাকুক।" আনোয়ারা বুলবুলির থুতনি ধরে আদর করে বলল, "আসলে কি তুই কুঁজা?"

"না।"

"তাহলে ডাকলে ডাকুক। তুই তাদের সাথে তর্ক করবি না।"

বুলবুল কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। আনোয়ারা আবার মনে করিয়ে দিল, "মনে থাকবে তো?"

"থাকবে।"

বুলবুলের অনেক কিছুই মনে রাখতে হয়। সে অন্য রকম সেটা সে কখনো ভুলতে পারে না। যতই দিন যাচ্ছে তার পাখাগুলো ততই বড় হয়ে উঠছে, কাপড় দিয়ে যখন পেঁচিয়ে রাখা হয় তখন তার কষ্ট হয়। কিন্তু সে অন্য রকম, তাই কষ্ট হলেও তাকে সেই কষ্ট সহ্য করতে হয়। মাঝে মাঝে বুলবুল ভাবে, সবাই এক রকম, সে অন্য রকম কেন? এই প্রশ্নটাও সে কাউকে করতে পারে না।

সকাল বেলা নাশতা করে বুলবুল তার বই-খাতা আর স্লেট নিয়ে স্কুলে রওনা হলো। এই চরে মানুষজন খুব বেশি না, কাজেই এখানে কোনো স্কুল নাই। কিছুদিন আগে শহর থেকে কিছু লোকজন এসে সবাইকে ডেকে লেখাপড়া নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলে একটা স্কুল তৈরি করে দিয়ে গেছে। সেটা অবশ্যি সত্যিকারের স্কুল না, এই স্কুলে চেয়ার টেবিল বেঞ্চ

www.doridro.com

নাই, একটা মাটির ঘরে হোগলা পেতে সব বাচ্চারা বসে। মালবিকা নামে নাদুসনুদুস একটা মহিলা তাদের পড়তে শেখায়, যোগ-বিয়োগ করতে শেখায়। বাচ্চারা এই স্কুলে যেতে চায় না কিন্তু বুলবুল খুব আগ্রহ নিয়ে যায়। লেখাপড়া জিনিসটা কী সে খুব ভালো করে জানে না কিন্তু সেটা শিখতে তার খুব আগ্রহ।

বুলবুল তার বই-খাতা আর স্লেট নিয়ে স্কুলে রওনা হলো। মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে অনেক তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় কিন্তু বুলবুল সব সময় নদীর তীর দিয়ে হেঁটে যায়। একা একা হাঁটার সময় সে নিজের মনে কথা বলে, ভারী ভালো লাগে তখন।

নদীর ধারে কমবয়সী কিছু ছেলেমেয়ে নদীর ঘোলা পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছিল, বুলবুলকে দেখে তারা চেঁচামেচি শুরু করল, দু-একজন গলা ফাটিয়ে ডাকল, "বুলবুল! এই বুলবুল!"

বুলবুল নদীর তীরে দাঁড়িয়ে বলল, "কী?"

"আয়, পানিতে আয়।"

বুলবুল মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ্।"

"কেন না?"

"স্কুলে যাই!"

"তুই স্কুলে গিয়ে কী করবি? জজ ব্যারিস্টার হবি?"

বুলবুল কোনো কথা বলল না। পানিতে দাপাদাপি করতে করতে একজন বলল, "কুঁজা জজ। কুঁজা ব্যারিস্টার। কুঁজা বুলবুল!"

তখন সবগুলো বাচ্চা হি হি করে হাসতে হাসতে পানিতে দাপাদাপি করতে থাকে।

বুলবুল কিছুক্ষণ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পায় বাচ্চাগুলো তাকে নিয়ে টিটকারি করছে। কুঁজা কুঁজা বলে চিৎকার করছে। বুলবুল বিড়বিড় করে নিজেকে বলল, "আমি কুঁজা না! আমি একদিন আমার এই পাখা দিয়ে আকাশে উড়ে যাব—কেউ তখন আমাকে খুঁজে পাবে না।"

স্কুলে গিয়ে দেখে তখনো সবাই আসেনি। স্কুলের সামনে খোলা জায়গাটাতে সবাই হা-ডু-ডু খেলছে। একজন বুলবুলকে ডাকল, "এই কুঁজা বুলবুল! আয় হা-ডু-ডু খেলবি।"

বুলবুল রাজি হলো না। তার শরীর পাখির পালকের মতো হালকা, সে

www.doridro.com

কাউকে ধরে রাখতে পারে না। কাউকে জাপটে ধরলে তাকেসহ টেনে নিয়ে যায়। তা ছাড়া খালা তাকে বলেছে সে যেন কখনো কারো সাথে ধাক্কাধাক্কি না করে। তার যে রকম পাখা আছে সেটা কাউকে জানতে দেয়া যাবে না, ঠিক সে রকম তার শরীর যে পাখির পালকের মতো হালকা সেইটাও কাউকে জানতে দেয়া যাবে না।

বুলবুল স্কুলের সামনে পা ছড়িয়ে বসে খেলা দেখতে লাগল, তখন লিপি তার ছোট ভাইটাকে কোলে নিয়ে হাজির হলো। বুলবুলের মতো লিপিরও খুব লেখাপড়া করার ইচ্ছা। তার ছোট ভাইকে দেখেশুনে রাখতে হয়, তারপরেও সে স্কুলে চলে আসে। লিপি বুলবুলের পাশে পা ছড়িয়ে বসে ছোট ভাইটাকে ছেড়ে দিল। ছোট ভাইটা ধুলোর মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ছোট ছোট পিঁপড়া খুঁজে বের করতে থাকে।

লিপি জিজ্ঞেস করল, "বুলবুল, তুই অঙ্কগুলো করেছিস?"

বুলবুল মাথা নাড়ল। স্কুলের সবাই তাকে কখনো না কখনো কুঁজা বুলবুল ডেকেছে—লিপি ছাড়া। লিপি তাকে কখনো কুঁজা বুলবুল ডাকেনি। সে জন্যে বুলবুল লিপিকে একটু পছন্দই করে।

লিপি বলল, "আমাকে অঙ্কগুলো দেখাবি?"

বুলবুল তার খাতা বের করে লিপিকে দেখাল। লিপি সেগুলো দেখে দেখে নিজের অঙ্কগুলো মিলিয়ে নেয়।

কিছুক্ষণের মাঝেই তাদের স্কুলের মালবিকা আপা এসে ঘরের তালা খুলে দিল। বুলবুল আর লিপি ভেতরে ঢুকে স্কুলঘরের জানালাটা খুলে দেয়। হোগলাপাতার মাদুরটা বিছিয়ে তাকের ওপর রাখা বইগুলো নামিয়ে আনতে থাকে। ততক্ষণে মাঠে খেলতে থাকা ছেলেগুলোও ক্লাসের ভেতরে এসে যার যার জায়গায় বসে গেছে। রোদে ছোটাছুটি করার কারণে একেকজন দরদর করে ঘামছে!

মালবিকা আপা ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে বলল, "সবাই এখন শান্ত হয়ে বস। আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করি।"

বাচ্চাগুলো শান্ত হওয়ার খুব একটা লক্ষণ দেখাল না। আপা খালি জায়গাগুলো দেখিয়ে বলল, "জলিল, মাহতাব আর কামরুল কই?"

একজন বলল, "কামরুল বাবার সাথে মাঠে কাম করে।"

আরেকজন বলল, "জলিলের জ্বর।"

www.doridro.com

বুলবুলের ভাসা ভাসাভাবে মনে পড়ল সে মাহতাবকে নদীর পানিতে দাপাদাপি করতে দেখেছে, কিন্তু সেটা নিয়ে সে নালিশ করল না।

আপা জিজ্ঞেস করল, "জলি আর আমিনা?"

লিপি বলল, "মনে হয় তারা লেখাপড়া করতে চায় না।"

আপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে সবাইকে বই খুলতে বলল। বাচ্চাগুলো বই খুলতে থাকে, প্রথমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার উপকারিতা নিয়ে একটা গল্প। তারপর লালপরী নীলপরী নিয়ে একটা কবিতা। কবিতার প্রথম চার লাইন মুখস্থ করতে দিয়ে আপা সবার অঙ্ক খাতাগুলো দেখতে শুরু করে দিল।

বুলবুল কবিতা মুখস্থ করতে করতে লালপরী নীলপরীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ফুটফুটে দুটি মেয়ে আকাশে উড়ছে, তাদের পেছনে প্রজাপতির পাখার মতো পাখা।

অঙ্ক খাতাগুলো বাচ্চাদের ফিরিয়ে দিয়ে আপা তাদের পড়া ধরতে শুরু করল। নখ কেন কাটতে হয়, খাবার আগে কেন হাত ধুতে হয়—এসব শেষ করে সবাইকে লালপরী নীলপরী কবিতার প্রথম চার লাইন জিজ্ঞেস করতে লাগল। সবারই মোটামুটি মুখস্থ হয়েছে তারপরেও একটা-দুইটা শব্দ তাদের বলে দিতে হলো। শুধু বুলবুলকে কিছু বলে দিতে হলো না, সে এক নিঃশ্বাসে পুরো চার লাইন কবিতা মুখস্থ বলে গেল।

আপা খুশি হয়ে বলল, "ভেরি গুড বুলবুল।"

দুষ্টু একটা মেয়ে ফিসফিস করে বলল, "কুঁজা মিয়া গুডি গুড।"

বুলবুল কথাটা শুনেও না শোনার ভান করে, লিপি তখন হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, "আপা।"

"বল লিপি।"

"পরী কি আসলেই আছে?"

আপা উত্তর দেয়ার আগেই সব ছেলেমেয়ে চিৎকার করে বলল, "আছে! আছে!"

আপা হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কেমন করে জান পরী আছে?"

একজন বলল, তার মা একদিন জোছনা রাতে বের হয়েছিল, তখন দেখেছে একটা গাছের ওপর থেকে পরী উড়ে উড়ে নেমে এসেছে। আরেকজন সেই গল্পটা সমর্থন করে বলল, পূর্ণিমার রাতে একটা বড় দিঘিতে

www.doridro.com

সব পরী গোসল করতে আসে। কাপড়গুলো দিঘির ঘাটে খুলে রেখে তারা ন্যাংটা হয়ে দিঘিতে গোসল করে। এই সময় দুষ্টু কয়েকটা ছেলে একজন আরেকজনের দিকে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকিয়ে হি হি করে হাসতে থাকে। মালবিকা আপা দেখেও না দেখার ভান করল।

লিপি জিজ্ঞেস করল, "পরীরা শুধু জোছনা রাতে আসে কেন?"

এর কোনো সদুত্তর ছিল না, একজন বলল, "আসলে পরীদের যখন খিদে লাগে তখন তারা জোছনার আলো খায়।"

বুলবুল এইবারে একটু আপত্তি করল। বলল, "জোছনা আবার কেমন করে খায়?"

যে বলেছে পরীরা জোছনার আলো খেয়ে বেঁচে থাকে সে গলা উঁচিয়ে বলল, তাঁর নানি নিজের চোখে দেখেছে যে একদিন জোছনা রাতে অনেকগুলো পরী উঠানে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কপকপ করে জোছনা খাচ্ছে। এ রকম অকাট্য প্রমাণ দেয়ার পর সেটা অবিশ্বাস করবে কেমন করে?। সবাই তখন মাথা নেড়ে সেটা মেনে নিল।

আরেকজন বলল, পরীদের চামড়া হয় খুব নরম, সূর্যের আলো লাগলে চামড়া পুড়ে যায় তাই তারা কখনো দিনের বেলা বের হয় না।

বুলবুল তখন মুখ শক্ত করে বলল, "তাহলে দিনের বেলা পরীরা কোথায় থাকে?"

"পরীদের দেশে।"

"সেইটা কোথায়?"

"আকাশের উপরে। অনেক দূরে।"

লিপি তখন হাত তুলে আবার জিজ্ঞেস করল, "আপা।"

"বল।"

"ছেলে পরী কি আছে?"

কেউ কিছু বলার আগেই বুলবুল বলল, "আছে।"

বুলবুলের কাছে বসে থাকা একজন মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ আছে। ছেলে পরীদের বলে জিন। আগুন দিয়ে তৈরি, পায়ের পাতা থাকে উল্টা দিকে। সামনের দিকে হাঁটলে তারা পেছনের দিকে চলে যায়।"

বুলবুল বলল, "মোটেই না। ছেলে পরী ঠিক মেয়ে পরীর মতো। পিঠে পাখা থাকে। আর–"

"আর কী।"

www.doridro.com

"খুব হালকা।"

কয়েকজন মাথা নেড়ে আপত্তি করল, বলল, "মেয়ে পরীরা হয় খুব সুন্দর কিন্তু ছেলে পরীরা হয় ভয়ঙ্কর। রাক্ষসের মতো চেহারা আর তারা আগুন দিয়ে তৈরি। মুখে পচা মাংসের গন্ধ।"

কে কখন কাকে জিনে ধরতে দেখেছে সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়, তখন মালবিকা হাত তুলে তাদের থামাল। বলল, "আসলে এগুলো হচ্ছে কল্পনা। পরী থাকুক আর নাই থাকুক তাতে কিছু আসে-যায় না। কল্পনা করলেই আছে। কল্পনায় সব কিছু থাকে।"

বুলবুল ভুরু কুঁচকে বলল, "আসলে পরী নাই?"

"না, বুলবুল। এগুলো সব কল্পনা। মেয়ে পরী ছেলে পরী কিছুই নাই।"

"কিছুই নাই?"

"না।"

বুলবুল মুখ শক্ত করে বলল, "আছে।"

"আছে?"

"হ্যাঁ আছে।"

মালবিকা বুলবুলের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে তুমি যদি বল আছে, তাহলে আছে।" মালবিকা এবারে গণিতের বইটা তুলে বলল, "পরীর গল্প শেষ হয়েছে, এখন চল সবাই মিলে আমরা নামতা শিখি। তিন-এর নামতা। আমার সাথে সাথে বল, তিন এক্কে তিন!"

সবাই সুর করে বলল, "তিন এক্কে তিন।"

"তিন দু গুণে ছয়।"

"তিন দু গুণে ছয়।"

স্কুলের শেষে বাচ্চাগুলো বাসার দিকে রওনা দেয়। লিপির ছোট ভাইটার খিদে লেগে গিয়েছে, তাই সে ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদতে শুরু করেছে। লিপি বাচ্চাটাকে কোল বদল করতে করতে তাড়াতাড়ি করে হাঁটার চেষ্টা করে। দুরন্ত ছেলেগুলো নদীর তীরে এসে ছুটতে ছুটতে কাপড় খুলতে খুলতে নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুলবুল তাদের দিকে এক ধরনের হিংসা নিয়ে তাকিয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। লিপি জিজ্ঞেস করল, "তুই যাবি না?"

www.doridro.com

"নাহ্!" তারপর হঠাৎ একেবারে অপ্রাসঙ্গিকভাবে জিজ্ঞেস করল, "লিপি তুই কি কোনো দিন পরী দেখেছিস?"

"না। তুই দেখেছিস?"

"আমি?" বুলবুল ইতস্তত করে বলল, "আমি—মানে ইয়ে—?" হঠাৎ করে থেমে গিয়ে লিপির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই পরী দেখতে চাস?"

"পরী?" লিপির মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন পড়ে, "আমি?"

"হ্যাঁ।"

"না ব্যবা রাত্রি বেলা আমার ভয় করে।"

"দিনের বেলা?"

লিপি অবাক হয়ে বলল, "দিনের বেলা? দিনের বেলা পরী দেখা যায়?"

"যায়।" বুলবুল গম্ভীর হয়ে বলল, "দেখা যায়।"

লিপি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "দেখব।"

"তুই যদি কাউকে না বলিস তাহলে তোকে দেখাব।"

লিপি বুলবুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই দেখাবি?" তারপর সে ফিক করে হেসে দিল।

বুলবুল কঠিন মুখ করে লিপির দিকে তাকালো, লিপি সেটা ভালো করে লক্ষ করল না। কোলে ছোট ভাইটা ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদছে, তাকে নিয়ে সে বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে।

www.doridro.com

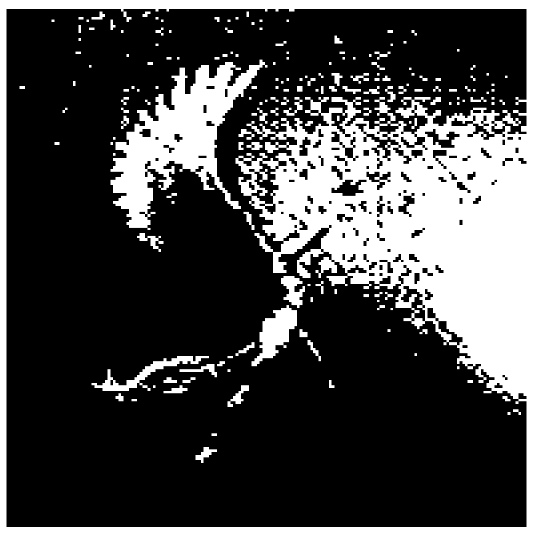

বিকেল বেলা বাড়ি ফিরে বুলবুল দেখল জহুর উঠানে একটা জলচৌকিতে বসে শরীরে তেল মাখছে। বুলবুল আনন্দে চিৎকার করে জহুরের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবা! তুমি এসেছ।"

"হ্যাঁ। এসেছি।"

"এত দেরি করেছ কেন?"

"কে বলেছে দেরি করেছি! মোটেই দেরি করি নাই। বলে গিয়েছিলাম দুই সপ্তাহের জন্যে যাব! ঠিক দুই সপ্তাহ পরে এসেছি।"

"দুই সপ্তাহ মানে জান? সাত দু গুণে চৌদ্দ দিন।"

"হ্যাঁ। বজরা নৌকা করে সুন্দরবনে ধানের চালানটা নিতে কত দিন লাগে তুই জানিস?"

বুলবুল জানে না এবং তার জানার খুব আগ্রহও নেই। সে জহুরের গলা জড়িয়ে ধরে রেখে বলল, "তুমি না থাকলে আমার ভালো লাগে না বাবা।"

"এই তো আছি আমি।" জহুর বুলবুলের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "তুই তোর খালাকে জ্বালাসনি তো?"

"না, বাবা।"

"ঠিকমতো থেকেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"লেখাপড়া করেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"সময়মতো বাড়ি এসেছিস?"

"হ্যাঁ।" বুলবুল একটু থেমে বলল, "কিন্তু বাবা—"

"কী?"

"আমার আর ভালো লাগে না।"

www.doridro.com

"কী ভালো লাগে না?"

"সব ছেলেমেয়ে আমাকে কেন কুঁজা ডাকে? আমি কি কুঁজা?"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বুলবুলকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "তুই কেন কুঁজা হবি?"

"তাহলে?"

"তোর পাখাগুলোকে যে ঢেকে রাখতে হয়। ঢেকে না রাখলে যে তোর বিপদ হয়ে যাবে!"

"কেন বিপদ হবে?"

জহুর আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সেটা তুই এখন বুঝবি না। আরেকটু বড় হয়ে নে, তখন তোকে বলব।"

বুলবুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বাবা।"

"কী?"

"আমার পাখাগুলো বেঁধে রাখলে এখন ব্যথা করে।"

"করারই তো কথা—আমাদের হাত-পা বেঁধে রাখলে ব্যথা করত না।"

"অনেক বড় হয়েছে পাখাগুলো। আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহলে—"

"তাহলে কী বাবা?"

"তাহলে আমি এখন উড়তে পারব।"

জহুর মাথা ঘুরিয়ে বুলবুলের দিকে তাকালো। বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ বাবা সত্যি।"

"ঠিক আছে, আজকে রাতে তাহলে দেখব।"

বুলবুল চকচকে চোখে বলল, "ঠিক আছে বাবা।"

রাতের খাওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে গেলে জহুর বুলবুলের হাত ধরে বের হলো। তখন রাত খুব বেশি হয়নি কিন্তু এই চর এলাকার মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, সন্ধ্যের পরই মনে হয় বুঝি নিশুতি রাত!

গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কুকুরগুলো প্রথম একটু ডাকাডাকি করে। যখন মানুষগুলোকে চিনতে পারে তখন আবার শান্ত হয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে পেছন পেছন হেঁটে খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে আসে।

গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে জহুর বুলবুলকে নিয়ে নদীর ঘাটে এসে

www.doridro.com

তার নৌকাটাতে বসে। লগি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকাটাকে পানিতে ঠেলে দিয়ে সে বৈঠাটা হাতে নেয়। বুলবুল নৌকার মাঝখানে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে, আস্তে আস্তে বলল, "অনেক অন্ধকার বাবা!"

জহুর বলল, "এক্ষুনি চাঁদ উঠবে, তখন দেখিস আলো হয়ে যাবে।"

জহুরের কথা সত্যি প্রমাণ করার জন্যেই কি না কে জানে নদীর তীরে বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে ঠিক তখন একটা বড় চাঁদ ভেসে উঠল। চাঁদের নরম আলোতে চারদিকে একটা কোমল ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে ঝিঁঝি ডাকতে থাকে, একটা রাতজাগা পাখি কর্কশ গলায় ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

বুলবুল একটু এগিয়ে জহুরের কাছাকাছি এসে বসে জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি বাবা।"

"নতুন যে চরটা উঠেছে সেখানে।"

"সেখানে কেন বাবা?"

"সেখানে তো কোনো মানুষ নাই সেই জন্যে। তা ছাড়া চরটা তো ধু-ধু ফাঁকা, তোর জন্যে মনে হয় সুবিধা হবে।"

বুলবুল একটু এগিয়ে জহুরের শরীরে হেলান দিয়ে বসে থাকে, বৈঠার নিয়মিত শব্দটার মাঝে মনে হয় একটা জাদুর মতো আছে, ধীরে ধীরে তার চোখে ঘুম নেমে আসছিল, তখন জহুর তাকে ডেকে তুলল, বলল, "ওঠ বাবা। আমরা এসে গেছি।"

বুলবুল জহুরের হাত ধরে চরে নেমে এল। এতক্ষণে চাঁদটা অনেক উপরে উঠেছে, বিস্তৃত চরটাতে জোছনায় নীলাভ একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। বুলবুল তার শরীর থেকে চাদরটা খুলে জহুরের হাতে দিয়ে তার পাখা দুটো একবার খুলে নেয়, আরেকবার বন্ধ করে নেয়। তারপর বড় করে খুলে নিয়ে একবার ঝাপটানি দেয়।

জহুর জিজ্ঞেস করল, "তুই কি আসলেই উড়তে পারবি?"

"মনে হয় পারব বাবা।"

"জোর করে চেষ্টা করিস না। যদি এখন না পারিস তাহলে থাক।"

বুলবুল কোনো কথা না বলে তার পাখা দুটো দুই পাশে ছড়িয়ে দেয়, তারপর মাথা নিচু করে সে ছুটতে শুরু করে, দেখে মনে হয় সে বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে কিন্তু সে পড়ে না। তার বড় বড় পাখা খুব ধীরে ধীরে ওপর থেকে নিচে নেমে আসতে থাকে এবং দেখতে দেখতে সে মাটি থেকে একটু

www.doridro.com

উপরে উঠে যায়। বুলবুলের শরীরটা ধীরে ধীরে মাটির সাথে সমান্তরাল হয়ে যায়, পাখার ঝাপটানিটা দ্রুততর হয়ে ওঠে এবং বুলবুল দেখতে দেখতে উপরে উঠে যায়।

জহুর সবিস্ময়ে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, অতিকায় একটা পাখির মতো বুলবুল বাতাসে ভেসে উঠছে। জহুর বুলবুলের পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে বলে, "বেশি উপরে উঠিস না বাবা! বেশি উপরে উঠিস না!"

জহুরের কথার জন্যেই হোক কিংবা অভ্যাস নেই বলেই হয়তো বুলবুল আবার নিচে নেমে আসতে থাকে।

মাটির কাছাকাছি এসে বুলবুল তাল সামলাতে পারল না, হুমড়ি খেয়ে দুই পাখা ছড়িয়ে বালুর মাঝে পড়ে গেল। জহুর ছুটতে ছুটতে বুলবুলের কাছে গিয়ে তাকে ধরে ওঠানোর চেষ্টা করে বলল, "বাবা, ঠিক আছিস তুই?"

বুলবুল মাথা নাড়ল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "হ্যাঁ বাবা আমি ঠিক আছি।"

"কী সুন্দর তুই উড়েছিস দেখলি?"

"হ্যাঁ বাবা। আমি আসলেই উড়তে পারি। দেখেছ?"

"হ্যাঁ দেখেছি।"

বুলবুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি আবার একটু উড়ি বাবা?"

জোছনার আলোতে বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে জহুর বলল, "উড়বি? উড়।"

বুলবুল তখন আবার তার দুটি পাখা দুই পাশে ছড়িয়ে দেয়, তারপর দুটি হাত বুকের কাছে নিয়ে আসে, মাথাটা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে সে সামনের দিকে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে তার বিশাল পাখা দুটি ধীরে ধীরে ঝাপটাতে থাকে, দেখতে দেখতে বুলবুল উপরে উঠে যেতে থাকে। প্রথমবার বেশি উপরে ওঠেনি কিন্তু এবারে সে উপরে উঠতেই থাকে, জোছনার আলোতে বুলবুল তার পাখা দুটি বিস্তৃত করে অতিকায় একটা পাখির মতো আকাশে উঠে যেতে থাকে। জহুর কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে, ঠিক কী কারণ জানা নেই সে বুকের ভেতর একটা গভীর ব্যথা অনুভব করে।

বুলবুল অনেক উপরে উঠে একটু ঘুরে যায়, তারপর ডানা দুটি মেলে আকাশে ভাসতে থাকে। মনে হয় পৃথিবীর সাথে তার বুঝি আর কোনো

www.doridro.com

যোগাযোগ নেই, মাটি থেকে অনেক উপরে আকাশের কাছাকাছি মেঘের জগতে বুঝি সে তার নতুন আবাসস্থল খুঁজে পেয়েছে। জহুরের মনে হয় বুকে ধরে বড় করা তার এই খুঁজে পাওয়া সন্তানটি বুঝি আর কোনো দিন মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসবে না।

আকাশ থেকে বুলবুল যখন মাটিতে নেমে এল তখন চাঁদটা পশ্চিমে অনেকখানি হেলে পড়েছে। বুলবুল তার পাখা দুটো ভাঁজ করে গুটিয়ে নিয়ে জহুরের দিকে এগিয়ে এল। জহুর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, বুলবুলের সারা শরীর কুয়াশায় ভিজে গেছে। চাদর দিয়ে মাথাটা মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর কষ্ট হয়েছে বাবা?"

"না বাবা, বেশি কষ্ট হয় নাই। উপরে ওঠার সময় একটু পরিশ্রম হয়, কিন্তু ভেসে থাকার সময় একটুও কষ্ট হয় না!"

"তোর পাখাগুলো ব্যথা করছে?"

"হ্যাঁ বাবা, পাখাগুলো একটু ব্যথা করছে।"

"কাল ভোরে আরো অনেক ব্যথা করবে দেখিস।"

"কেন বাবা?"

"কখনো কোনো দিন ব্যবহার করিসনি, হঠাৎ একবারে এতক্ষণ উড়ে বেড়ালে ব্যথা করবে না?"

"করলে করবে।"

"উড়তে কেমন লাগে বাবা?"

"খুব অদ্ভুত। তুমি জানো উপরে উঠে গেলে মনে হয় সবকিছু সমান হয়ে গেছে!"

জহুর নিঃশব্দে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু না বুঝেই এই ছোট শিশুটি কত বড় একটা কথা বলে ফেলেছে! জহুর বুলবুলের হাত ধরে বলল, "আয় বাড়ি যাই।"

"চল বাবা।"

নৌকায় উঠে লগি দিয়ে নৌকাটাকে নদীর মাঝে ঠেলে দিয়ে জহুর বলল, "বুলবুল।"

"হ্যাঁ বাবা।"

"তোকে একটা জিনিস বলি।"

"বল।"

"যদি তোর কখনো লুকিয়ে থাকতে হয় তাহলে তুই এসে এই চরের

www.doridro.com

মাঝে লুকিয়ে থাকবি। ঠিক আছে?"

বুলবুল অবাক হয়ে বলল, "লুকিয়ে থাকতে হবে? লুকিয়ে থাকতে হবে কেন?"

"আমি বলছি না তোর লুকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু যদি কখনো দরকার হয় তাহলে এই চরে এসে লুকিয়ে থাকবি। আমি পরে এসে তোকে খুঁজে বের করব। ঠিক আছে?"

বুলবুল মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।" তারপর সে তার বাবার কোলে মাথা রেখে নৌকার গলুইয়ে শুয়ে পড়ে। চাঁদটাকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি এক পাশে খানিকটা ভেঙে দিয়েছে! কেমন করে চাঁদটা এভাবে ভেঙে যায় সেই কথাটি তার মাথার মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে, বাবাকে জিজ্ঞেস করলে হয়। কিন্তু হঠাৎ করে তার সারা শরীর ক্লান্তিতে অবশ হয়ে যায়। তারা চোখ ভেঙে ঘুম নেমে আসে, কিছু বোঝার আগেই বুলবুল গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

ভোরবেলা আনোয়ারা এসে দেখে জহুর উঠানের মাঝখানে জলচৌকিতে চুপচাপ বসে আছে। আনোয়ারাকে দেখে বলল, "আস আনোয়ারা বুবু। বস।"

আনোয়ারা বলল, "বুলবুল আজকে স্কুলে গেল না?"

"না।" জহুর মাথা নাড়ে, "ঘুমাচ্ছে।"

"এখনো ঘুমাচ্ছে?"

"হ্যাঁ। কাল রাতে ঘুমাতে অনেক দেরি হয়েছে তো।"

"কেন? দেরি হয়েছে কেন?"

"নদীর মাঝখানে যে নতুন চরটা উঠেছে সেখানে গিয়েছিলাম।"

আনোয়ারা চোখ কপালে তুলে বলল, "এত রাত্রে? চরে?"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"কেন?"

"বুলবুল আকাশে উড়তে চাইছিল তাই নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"উড়তে? আকাশে উড়তে?"

"হ্যাঁ।"

"উড়েছে?"

"হ্যাঁ। কী সুন্দর আকাশে উড়ে গেল। বুবু তুমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না।"

www.doridro.com

"সত্যি?"

"হ্যাঁ বুবু। সত্যি।"

"কী আশ্চর্য!"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? বুলবুলের তো জন্ম হয়েছে আকাশে উড়ার জন্যে! সে আকাশে উড়বে না?"

"তাই বলে একজন মানুষ পাখির মতো আকাশে উড়বে?"

"বুলবুল কি পুরোপুরি মানুষ?"

"মানুষ না?"

"না। পুরোপুরি মানুষ না। মানুষের পাখা থাকে না। মানুষের শরীর এত হালকা হয় না! মানুষ আকাশে উড়ে না। বুলবুল হচ্ছে এক সাথে মানুষ আর পাখি। আমি চেষ্টা করেছিলাম সে যখন ছোট ছিল তার পাখা দুটো কেটে ফেলতে। পারি নাই। এখন তো আর পারা যাবে না।"

আনোয়ারা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল। জহুর বলল, "আনোয়ারা বুবু, আমি তোমার সাথে একটু পরামর্শ করি।"

আনোয়ারা বলল, "আমার সাথে?"

"হ্যাঁ। বুলবুল গত রাত্রে আকাশে উড়েছে। এইটা ছিল তার প্রথম উড়া। সে আরো উড়বে। একশবার উড়বে, হাজারবার উড়বে। সে যত সময় মাটিতে থাকে তার চাইতে বেশি সময় সে আকাশে থাকবে। তার মানে কী জান?"

"কী?"

"আগে হোক, পরে হোক তাকে কেউ না কেউ দেখবে। তখন কী হবে?"

"হ্যাঁ। কী হবে?"

"তখন তাকে ধরার চেষ্টা করবে। যদি ধরতে পারে তাহলে নিয়ে যাবে। কাটাকুটি করবে, তা না হলে কোথাও বেচে দেবে। খাঁচার মাঝে ভরে রাখবে, মানুষ টিকেট কিনে দেখবে।"

আনোয়ারা শুকনো মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ আনোয়ারা বুবু, ব্যাপারটা চিন্তা করে আমি কাল রাতে ঘুমাতে পারি নাই।"

"তাহলে কী করবে?"

"আমি জানি না। খালি চেষ্টা করতে হবে ব্যাপারটা যেন কারো চোখে

www.doridro.com

না পড়ে। কেউ যেন জানতে না পারে।"

বুলবুল যখন ঘুম থেকে উঠেছে তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। সে আরো ঘুমাত কিন্তু তার ঘুম ভেঙে গেল প্রচণ্ড ব্যথায়। দুই পাখা, পিঠ আর ঘাড়ে অসম্ভব ব্যথা। জহুর তাকে তার কোলে উপুড় করে শুইয়ে রসুনে ভেজানো গরম সরিষার তেল দিয়ে সারা শরীরে ডলে দিতে লাগল।

শরীরের ব্যথা নিয়ে সারাটি দিন বুলবুল আহা উহু করলেও সন্ধ্যেবেলা সে জহুরের হাত ধরে লাজুক মুখে বলল, "বাবা!"

"কী?"

"আমার আবার আকাশে উড়ার ইচ্ছে করছে!"

জহুর চোখ কপালে তুলে বলল, "আকাশে উড়ার ইচ্ছে করছে?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"তোর না সারা শরীরে ব্যথা!"

বুলবুল তার পাখাগুলো একটু ছড়িয়ে আবার গুটিয়ে নিয়ে বলল, "ব্যথা কমে গেছে বাবা!"

জহুর কিছুক্ষণ বুলবুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে!"

রাত যখন গভীর হয়ে এলো জহুর আবার বুলবুলকে নৌকা করে নিয়ে গেল জনমানবহীন সেই চরে। বুলবুল আবার পাখা ঝাপটিয়ে আকাশে উড়ে গেল—আগের দিন থেকেও অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসে!

এভাবেই শুরু হলো। প্রতিরাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে গেছে তখন জহুর বুলবুলকে নৌকা করে নিয়ে গেছে চরে। পুবের আকাশ ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত বুলবুল আকাশে উড়েছে!

দুই সপ্তাহ পর জহুরের আবার ডাক পড়ল গম বোঝাই বড় একটা নৌকার মাঝি হয়ে সুন্দরবনের গহিনে যাবার জন্যে। জায়গাটা বিপজ্জনক, সবাই যেতে চায় না, তাই কেউ যখন যায় তাকে ভালো মজুরি দেয়া হয়। দুই সপ্তাহ পরিশ্রম করলে চার সপ্তাহ শুয়ে-বসে কাটিয়ে দেয়া যায়।

জহুর যখন বিদায় নিয়ে রওনা দিয়েছে তখন বুলবুল তার পেছনে পেছনে এসেছে। নদীর ঘাটে বুলবুল জহুরের হাত ধরে বলল, "বাবা।"

"বল।"

"এখন আমাকে চরে কে নিয়ে যাবে?"

www.doridro.com

"তোকে নেয়ার এখন কেউ নেই। আমি না আসা পর্যন্ত তোর আকাশে উড়াউড়ি বন্ধ।"

"কিন্তু বাবা—"

"কোনো কিন্তু নেই।"

"আমার যদি খুব উড়ার ইচ্ছে করে?"

"ইচ্ছে করলেই হবে না। আমি না আসা পর্যন্ত উড়তে পারবি না।"

বুলবুল অনিচ্ছার ভঙ্গি করে বলল, "ঠিক আছে।"

www.doridro.com

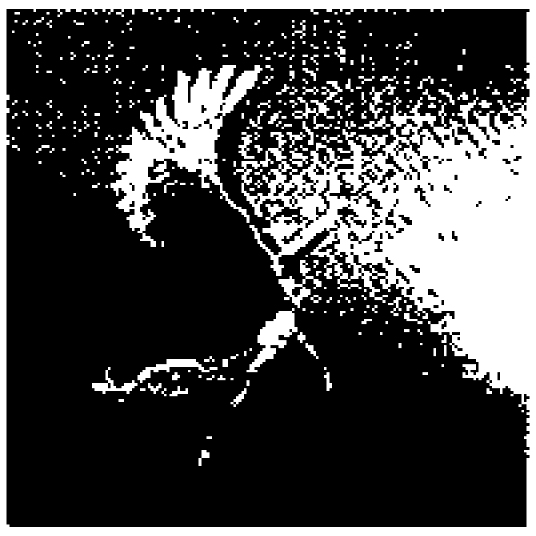

জহুরদের নৌকাটা চারদিন পর সুন্দরবনের ভেতরে পৌঁছাল। জোয়ারের সময় এটাকে নোঙর করে রেখে শুধু ভাটির সময় দক্ষিণে বেয়ে নেয়া হতো। সুন্দরবনের গহিনে নিবিড় অরণ্য, রাত্রি বেলা ঘুমানোর সময় রীতিমতো ভয় করে। বন বিভাগ থেকে একজন আনসার দেয়া হয়েছে, সে একটা পুরানো বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয়। এই বন্দুকটি দিয়ে শেষবার কবে গুলি ছোড়া হয়েছে সেটা কেউ জানে না, বিপদের সময় এটা থেকে গুলি বের হবে কি না সেটা নিয়েও সবার মাঝেই সন্দেহ আছে।

গমের বোঝা নামিয়ে জহুর আর মাঝি মাল্লারা নৌকা নিয়ে আরো গভীরে ঢুকে যায়, বন বিভাগের কিছু গাছের গুঁড়ি তাদের নিয়ে যেতে হবে। জহুর আগে কখনো এত গভীরে আসেনি, এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সে এই নির্জন অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। নদীর তীরে হরিণের দল পানি খেতে আসে, সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক সেদিক দেখে চুকচুক করে একটু পানি খেয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ছন্দ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে গহিন বনে অদৃশ্য হয়ে যায়। গাছের ডালে বানর-শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বানর-মায়েরা বসে থাকে। গাছের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে খেতে অকারণেই তারা তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। নদীর তীরে কাদায় কুমির মুখ হাঁ করে রোদ পোহায়। দেখে মনে হয় বুঝি ঢিলেঢালা প্রাণী কিন্তু মানুষের সাড়া পেলেই বিদ্যুৎগতিতে নদীর পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। গাছে হাজার হাজার পাখি কিচিরমিচির করে ডাকছে। জহুর সবকিছু এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দেখে।

নৌকায় যখন গাছের গুঁড়ি তোলা হচ্ছে তখন জহুর আনসার সদস্যটির সাথে বনের ভেতর হাঁটতে বের হলো। মানুষটি কথা বলতে ভালোবাসে, জহুর কথা বলে কম কিন্তু ধৈর্য ধরে শুনতে পারে, তাই দুজনের জুটিটি হলো চমৎকার। আনসারের সদস্যটা বন্দুকটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল,

www.doridro.com

"এই যে আমরা হাঁটছি, আপনি ভাবছেন আমাদের কেউ দেখছে না। আসলে এইটা সত্যি না। আমাদের কিন্তু দেখছে।"

"কে দেখছে?"

"কে আবার? মামা।"

জহুর এত দিনে জেনে গেছে সুন্দরবনে বাঘকে সম্মান করে মামা বলা হয়—বাঘকে নাম ধরে ডাকা নিয়ে একটা কুসংস্কার আছে।

সে মাথা নেড়ে বলল, "অ।"

"সব সময় আমাদের চোখে চোখে রাখে। নিঃশব্দে আমাদের পেছনে পেছনে হাঁটে।"

"এখনো হাঁটছে?"

"নিশ্চয়ই হাঁটছে। যাওয়ার সময় দেখবেন পায়ের ছাপ। আমাদের পেছনে পেছনে হেঁটে যাচ্ছে।"

জহুর জিজ্ঞেস করল, "আমাদের খেয়ে ফেলবে না তো?"

"নাহ্! বাঘ মানুষকে খায় না। জঙ্গলে এত মজার মজার খাবার আছে মানুষকে খাবে কেন? মানুষের শরীরে গোশত আর কতটুকু, সবই তো হাড্ডি।"

জহুর এভাবে কখনো চিন্তা করে দেখেনি—সে কোনো কথা বলল না। আনসার কমান্ডার বলল, "জঙ্গলে হাঁটার একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়ম মানতে হয় তাহলে মামা সমস্যা করে না।"

"কী নিয়ম?"

"বাতাস। বাতাসের উল্টা দিকে হাঁটতে হয়। মামা তো অনেক দূর থেকে ঘ্রাণ পায় তাই মামা ভাবে আমরাও পাই। তাই বাতাসের উল্টা দিকে থাকে, যেন আমরা তাদের ঘ্রাণ না পাই!"

জহুর বলল, "অ।"

আনসার কমান্ডার তার বন্দুক হাতবদল করে বলল, "যারাই সুন্দরবনে আসে তারাই খালি মামা মামা করে। এই জঙ্গলে মামা ছাড়াও অনেক কিছু আছে। নানা রকম প্রাণী আছে। তাদেরকে কেউ দেখতে পায় না"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। একরকম গুইসাপ আছে এক মানুষ লম্বা। সাপ আছে হাজারো কিসিমের। নদীতে কুমির কামট আর মাছ। গাছে বানর আর পাখি।"

জহুর বলল, "অ।"

www.doridro.com

"সমস্যা একটা। তাই মানুষ সুন্দরবনে থাকে না।"

"কী সমস্যা?"

"পানি। খাবার পানি নাই। লোনা পানি।"

"জঙ্গলে পুকুর কাটলেই পারে।"

"সেই পুকুরে কি আর মিষ্টি পানি পাওয়া যায়? সেই পানিও লোনা।"

জহুর বলল, "অ।"

"তবে জঙ্গলে মানুষ থাকে না সেই কথা পুরোপুরি ঠিক না।"

"থাকে নাকি?"

আনসার কমান্ডার বলল, "জঙ্গলের ভেতর যাদের নাম নিতে নাই তারা তো থাকেই।"

"তারা কারা? ভূত?"

আনসার কমান্ডার বিরক্ত হয়ে বলল, "আহ্ হা! নাম কেন নিলেন?"

"ঠিক আছে আর নিব না।"

"শহরে তো হইচই গোলমাল, সেখানে তো আর তেনারা থাকতে পারেন না, সব জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন। অন্ধকার হলেই শুরু হয় তেনাদের খেলা।"

জহুর হাসি গোপন করে বলে, "অ।"

আনসার কমান্ডার বলল, "তয় আসল মানুষও দেখেছিলাম একজন। বিডিআর কমান্ডার ছিল। দুইটা মার্ডার করে জঙ্গলে চলে এসেছিল। পুলিশ যখন ধরেছে তখন এই লম্বা দাড়ি, দেখে মনে হয় জিন!"

জহুর বলল, "অ।"

"চোখ লাল, শরীরে চামড়া কয়লার মতো কালো।"

"লোনা পানি খেয়ে থাকত?"

"নাহ্। কমান্ডারের মাথায় বিশাল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। পানির উপরে একটা প্লাস্টিক বিছিয়ে রাখত, সেইখানে যে পানি জমা হতো সেইটায় লবণ নাই।"

"আর খাবার খাদ্য?"

আনসার কমান্ডার হা হা করে হেসে বলল, "সুন্দরবনে কি খাবার খাদ্যের অভাব আছে নাকি? গাছে কত ফলমুল কত মধু। বনমোরগ, হরিণ, মাছ!"

"সেই বিডিআর কমান্ডার কি কাঁচা খেত?"

www.doridro.com

"নাহ্! বিশাল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি! ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আগুন ধরাত।"

"সেইটা আবার কী?"

"চশমার কাচের মতোন, ছোট জিনিস বড় দেখা যায়।"

"সেইটা দিয়ে আগুন ধরানো যায়?"

"হ্যাঁ। সূর্যের আলোতে ধরলেই আগুন জ্বলে।"

সূর্যের আলোতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরা হলে কেন আগুন ধরে সেটা জানার জন্যে জহুরের একটু কৌতূহল ছিল কিন্তু সে আর জিজ্ঞেস করল না।

ঠিক তখন গাছে একটু খচমচ করে শব্দ হলো এবং জহুর দেখল বড় ঝাপড়া একটা গাছের ওপর থেকে বিশাল একটা পাখি হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যেতে শুরু করেছে।

আনসার কমান্ডার বলল, "কী আচানক ব্যাপার!"

জহুর জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"কত বড় পাখি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ।" জহুর এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ আনসার কমান্ডার তার বন্দুকটা তুলে পাখির দিকে তাক করল। জহুর অবাক হয়ে বলল, "কী করেন?"

আনসার কমান্ডার কোনো কথা না বলে উড়ন্ত পাখিটার দিকে তার নিশানা ঠিক করতে থাকে। জহুর আবার জিজ্ঞেস করল, "কী করেন?"

ঠিক যখন ট্রিগার টান দেবে তখন জহুর খপ করে বন্দুকটা ধরে একটা হেঁচকা টান দিল। প্রচণ্ড গুলির শব্দে জঙ্গলটা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

আনসার কমান্ডার যেটুকু অবাক হলো তার থেকে রাগ হলো অনেক বেশি। চিৎকার করে বলল, "কী করলেন আপনি? কী করলেন?"

"পাখিটারে খামোখা গুলি করতে যাচ্ছিলেন—"

"আমার ইচ্ছা। আমি দরকার হলে পাখিরে গুলি করব, দরকার হলে পাখির বাবারে গুলি করব। আপনি কেন আমার হাতিয়ারে হাত দিবেন?"

জহুর মুখ শক্ত করে বলল, "কারণ কিছু নাই, খামোখা কেন আপনি পাখিটাকে মারবেন?"

আনসার কমান্ডার বুকে থাবা দিয়ে বলল, "আমার ইচ্ছা।"

জহুর শীতল গলায় বলল, "কমান্ডার সাহেব, আপনি যখন একা থাকবেন, তখন আপনার ইচ্ছে হলে পাখি কেন হাতিকেও মারতে পারেন।

www.doridro.com

কিন্তু আমি যদি পাশে থাকি তাহলে খামোখা একটা পাখিকে মারতে দিব না।"

"কেন?"

জহুর উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কারণটা ঠিক জানি না।"

আনসার কমান্ডার অবাক হয়ে জহুরের দিকে তাকিয়ে রইল। জহুরের মনে হলো সত্যিই কি সে কারণটা জানে না?

বুলবুল বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে। কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসে না। সারা শরীরে কেমন যেন এক ধরনের অস্থির ভাব, সে কিছুতেই অস্থিরতার কারণটা বুঝতে পারছে না। যখন জহুর ছিল তখন সে প্রতিরাতে চরে গিয়ে আকাশে উড়েছে, জহুর চলে যাওয়ার পর সে উড়তে পারছে না, কিন্তু তার সারা শরীর উড়ার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে। তার শুধু ইচ্ছে করছে পাখা দুটি দুই পাশে মেলে দিয়ে ঝাপটাতে থাকে কিন্তু সে ঘরের ভেতরে এটা করতে পারছে না।

বুলবুল খানিকক্ষণ জোর করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকার চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হলো না। খানিকক্ষণ ছটফট করে সে শেষ পর্যন্ত উঠে বসল, তারপর সাবধানে বিছানা থেকে নেমে এল, পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে ছিটকানি খোলার চেষ্টা করল।

আনোয়ারা পাশের খাটেই শুয়ে ছিল, তার ঘুম খুব পাতলা, ছিটকানি খোলার শব্দ শুনেই সে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"আমি খালা।"

আনোয়ারা উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, "তুই? এত রাতে ছিটকানি খুলে কোথায় যাস।"

বুলবুল বলল, "একটু বাইরে যাব খালা।"

"কেন? পেশাব করবি?"

"না খালা।"

"তাহলে?"

"ঘরের ভেতরে থাকতে পারছি না। একটু বাইরে গিয়ে পাখা ঝাপটাতে হবে খালা।"

আনোয়ারা কী বলবে বুঝতে পারল না। তার পাখা নেই, একজন

www.doridro.com

মানুষের পাখা থাকলে তার কেমন লাগে, তাকে কী করতে হয়, সেটা সে জানে না। সেটা শুধু যে সে জানে না তা নয়, মনে হয় পৃথিবীর কেউই জানে না। তাই বুলবুল যে মাঝরাতে ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে গিয়ে পাখা ঝাপটাতে চাইছে সেটার পেছনে কোনো যুক্তি আছে কি নেই সেটা আনোয়ারা বুঝতে পারে না।

আনোয়ারা বলল, "বাবা বুলবুল, এত রাতে বাইরে বের হবি পাখা ঝাপটানোর জন্যে? যদি কেউ দেখে ফেলে?"

"দেখবে না খালা—" বুলবুল অনুনয় করে বলল, "সবাই এখন ঘুমাচ্ছে। তা ছাড়া বাইরে কুচকুচে অন্ধকার, কেউ দেখতে পাবে না।"

আনোয়ারা মাথা নাড়ল, বলল, "উহুঁ! জহুর একশবার করে না করে গেছে সে না আসা পর্যন্ত তোকে যেন উড়তে না দিই!"

"আমি উড়ব না খালা! আমি শুধু পাখা ঝাপটাব!"

"একই কথা।"

"খালা আমাকে একটু বের হতে দাও। এই একটুখানি—"

আনোয়ারা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু তোকে আমি একা বের হতে দিব না। আমি আগে যাব, দেখব কেউ আছে কি না।"

বুলবুল খুব খুশি হয়ে রাজি হলো, বলল, "ঠিক আছে।"

তখন সেই নিশুতি রাতে বুলবুলের হাত ধরে আনোয়ারা বের হলো। উঠোনে উঁকি দিয়ে দেখল যখন কেউ নেই তখন বুলবুল দুই পাখা ছড়িয়ে দিয়ে সেগুলো ঝাপটাতে থাকে। আনোয়ারা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে—সে কি কখনো ভেবেছিল একজন মানুষের পাখির মতো পাখা হবে? সেই মানুষটিকে সে বুকে ধরে বড় করবে?

বার দুয়েক ডানা ঝাপটিয়ে বুলবুল থেমে যায়—আনোয়ারা বলল, "হয়েছে? এখন ভেতরে আয়।"

বুলবুল বলল, "হয়নি খালা। উঠোনটা কত ছোট দেখেছ? পাখাটা ভালো করে ছাড়াতেই পারছি না। সামনের মাঠটাতে একটু যাই?"

আনোয়ারা আঁতকে উঠে বলল, "না, বুলবুল না! সর্বনাশ!"

"একটুখানি! এই একটুখানি!"

"সর্বনাশ! কেউ দেখে ফেলবে।"

"কেউ দেখবে না খালা! দেখছ না কেউ নাই? সবাই ঘুমিয়ে আছে।"

"হঠাৎ করে কেউ চলে আসবে!"

www.doridro.com

"আসবে না খালা! আমি একবার যাব আর আসব।"

আনোয়ারা কিছু বলার আগেই বুলবুল দুই পা ছড়িয়ে উঠোন থেকে বের হয়ে সামনের মাঠে ছুটে যেতে থাকে। আনোয়ারা কাঠ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে বুলবুলের ফিরে আসার জন্যে।

অন্ধকারের মাঝে বুলবুলকে আবছা আবছাভাবে দেখা যায়। সে খোলা মাঠের উপর দিয়ে ডানা মেলে ছুটে যাচ্ছে—হঠাৎ হঠাৎ করে সে ডানা ঝাপটিয়ে একটু উপরে উঠে যাচ্ছে, আবার নেমে আসছে। দেখতে দেখতে বুলবুল মাঠের অন্যপাশে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। আনোয়ারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে এবং একসময় দেখতে পায় বুলবুল ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আবার ফিরে আসছে। আনোয়ারার বুকের ভেতর পানি ফিরে আসে। বুলবুল কাছে আসতেই সে ফিসফিস করে ডেকে বলল, "আয় এখন! ভেতরে আয়। এক্ষুনি আয়।"

"আর একবার ছোট খালা। মাত্র একবার!"

"না।"

"মাত্র একবার। এই শেষ খালা—" বলে বুলবুল পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাঠের অন্যপাশে ছুটে যেতে থাকে।

আনোয়ারা আবার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারে সে আবছা আবছা দেখতে পায় বুলবুল পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময় আনোয়ারা টর্চলাইটের আলোর একটা ঝলকানি এবং দুজন মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেল, সাথে সাথে আতঙ্কে তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল।

আনোয়ারা তার উঠানের আড়ালে সরে যায়—এখন বুলবুলকে দেখতে না পেলেই হলো। সে বিড়বিড় করে বলল, "হে খোদা! হে দয়াময়—বুলবুলকে যেন এই মানুষগুলো দেখতে না পায়। বুলবুল ফিরে আসতে আসতে মানুষগুলো যেন চলে যায়। হে খোদা! হে পরওয়ারদিগার। হে রাহমানুর রাহিম।"

কিন্তু খোদা আনোয়ারার দোয়া শুনল না, কারণ হঠাৎ করে সে মানুষ দুজনের ভয়ার্ত গলার স্বর শুনতে পায়। একজন চমকে উঠে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "এইটা কী?"

দ্বিতীয়জন চাপা গলায় বলল, "হায় খোদা। সর্বনাশ।"

www.doridro.com

আনোয়ারা দেখল বুলবুল নিশ্চিন্ত মনে ছুটে আসছে। সে জানেও না সামনে অন্ধকারে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—তাদের হাতে একটা টর্চলাইট। মানুষগুলো ভীত এবং আতঙ্কিত। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী হচ্ছে ভীত এবং আতঙ্কিত মানুষ—তারা বুঝে হোক না বুঝে হোক ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে। মানুষগুলো কী করবে আনোয়ারা জানে না। সে এখন চিন্তাও করতে পারছে না।

আনোয়ারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং দেখতে পায় বুলবুল ছুটতে ছুটতে কাছাকাছি এসে হঠাৎ করে মানুষ দুজনকে দেখতে পায়। সাথে সাথে সে দাঁড়িয়ে গেল—অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, মানুষগুলো বোঝার চেষ্টা করছে। ঠিক তখন মানুষগুলোর একজন টর্চলাইটটা জ্বালিয়ে দিল, তীব্র আলোতে বুলবুলের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, সাথে সাথে সে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল! মানুষগুলো হতবাক হয়ে দেখল একজন শিশু পাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

"ইয়া মাবুদ! জিনের বাচ্চা!" বলে একজন মানুষ চিৎকার করে ওঠে।

"ধর! ধর জিনের বাচ্চাকে—" বলে হঠাৎ মানুষগুলো বুলবুলকে ধরার জন্যে ছুটে যেতে থাকে।

বুলবুল হঠাৎ করে যেন বিপদটা টের পেল, সাথে সাথে ঘুরে সে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করে। দুই পাখা সে দুই পাশে মেলে দেয়। বিশাল ডানা ছড়িয়ে সে ছুটতে থাকে, মানুষগুলো ঠিক যখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল তখন সে পাখা ঝাপটিয়ে উপরে উঠে গেল।

মানুষ দুজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পায় বুলবুল পাখা ঝাপটিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। তারা টর্চলাইটের আলোতে দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু ভালো করে কিছু দেখতে পেল না, দেখতে দেখতে বুলবুল টর্চলাইটের আলোর সীমানার বাইরে চলে গেল।

আনোয়ারা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখতে পায় মানুষ দুজনের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে আরো মানুষ লাঠিসোটা নিয়ে হাজির হচ্ছে। লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি হইচই, দেখতে দেখতে সেখানে বিশাল একটা জটলা শুরু হয়ে গেল। তারা সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে থাকে। আনোয়ারা বুঝতে পারে তার শরীর থরথর করে কাঁপছে।

ভোর রাতে আনোয়ারা দেখল বুলবুল খুব সাবধানে বাসার পেছন দিয়ে এসে

www.doridro.com

ঘরে ঢুকল। তার চোখে-মুখে আতঙ্ক। আনোয়ারা ছুটে গিয়ে বুলবুলকে জাপটে ধরে বলল, "তুই কোন দিক দিয়ে এসেছিস?"

"পিছনের বড় গাছটার ওপর নেমে লুকিয়ে ছিলাম।"

"কেউ দেখে নাই তো?"

"না খালা।"

"তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে আয়।"

বুলবুল আনোয়ারার হাত ধরে ঘরে ঢুকল। আনোয়ারা শুকনো গামছা দিয়ে শরীরটা মুছতে মুছতে বলল, "কী সর্বনাশ হয়েছে দেখেছিস? তোকে দেখে ফেলেছে। এখন কী হবে?"

"মনে হয় চিনে নাই খালা, আমি তো মুখ ঢেকে রেখেছিলাম।"

"তুই কেমন করে জানিস চিনে নাই?"

"চিনলে এতক্ষণে সবাই বাড়িতে চলে আসত না?"

আনোয়ার মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা ঠিক। কেউ বাড়িতে আসে নাই।"

"তারা চিনে নাই। খালি বলছিল জিনের বাচ্চা! জিনের বাচ্চা কেন বলছিল খালা?"

"তোর পাখা দেখে। মানুষের পিঠে কি পাখা থাকে?"

"খালা।"

"উঁ।"

"আমি কি আসলেই জিনের বাচ্চা?"

"ধুর বোকা, তুই কেন জিনের বাচ্চা হবি?"

"তাহলে আমার পাখা কেন আছে?"

"আমি এত কিছু বুঝি না, তুই ঘুমা।" আনোয়ারা একটু ভেবে বলল, "আর শোন।"

"কী খালা।"

"সকাল বেলা ঘর থেকে বের হবি না। যদি দেখি লোকজন আসছে আমি তাদের আটকে রাখব, তুই পিছন দরজা দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে যাবি।"

"ঠিক আছে খালা।"

আনোয়ারা হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "জহুর যখন আসবে, শুনে কী রাগ করবে!"

www.doridro.com

জহুর শুনে রাগ করল না, শুনে সে খুব ভয় পেল। ঘটনাটার কথা অবশ্যি সে আনোয়ারার মুখে শোনেনি। ঘাটে নৌকা থেকে নেমে সে যখন মাত্র তীরে উঠেছে তখনই একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ জহুরকে বলল, "জহুর শুনেছ ঘটনা?"

"কী ঘটনা।"

"সদর থেকে আক্কাস আর জালাল আসছিল। রাত্রি বেলা। তোমার বাড়ির সামনে যে মাঠ সেই মাঠে জিন দেখেছে।"

"জিন?"

"হ্যাঁ। এই বড় বড় দাঁত, চোখের মাঝে আগুন। সাপের মতো লেজ।"

জহুর হাসি গোপন করে বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। সেই মাঝরাত্রে কী হইচই, লাঠিসোটা নিয়ে আমরা সবাই বের হয়েছিলাম।"

জহুর বলল, "জিনটাকে ধরেছ?"

"নাহ্ ধরা যায়নি।"

"কেন ধরা গেল না?"

"আকাশে উড়ে গেছে।"

হঠাৎ করে জহুর ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল, কিন্তু বাইরে সে সেটা প্রকাশ হতে দিল না। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "উড়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে উড়ে গেল?"

"আমি তো নিজের চোখে দেখি নাই। আক্কাস আর জালাল দেখেছে। পাখা বের করে উড়ে চলে গেছে।"

জহুর নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, "পাখা?"

"হ্যাঁ। পাখা আছে। বড় বড় পাখির মতোন পাখা।"

জহুর কিছু বলল না, কিন্তু তার বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ড ধ্বক ধ্বক করতে লাগল। মধ্যবয়স্ক মানুষটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার কী মনে হয় জান জহুর?"

"কী?"

"নবীগঞ্জের পীর সাহেবরে এনে এই চরে একটা খতম পড়ানো দরকার।"

www.doridro.com

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "হুঁ।"

খানিকটা সামনে এসে দেখল একটা ছোট জটলা, জহুর দাঁড়িয়ে যায় এবং শুনতে পায় সেখানেও জিনের বাচ্চাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তবে এখানে জিনের বাচ্চার বর্ণনা এত ভয়ঙ্কর নয়, গায়ের রং ধবধবে সাদা, শরীরে একটা সুতাও নেই, মাথায় ছোট ছোট দুইটা শিং। জহুর আরেকটু এগিয়ে যাওয়ার পর আরো একজনের সাথে দেখা হলো, সেও জহুরকে জিনের বাচ্চার গল্প শোনাল, তার ভাষ্য অনুযায়ী জিনের বাচ্চা চিকন গলায় একটা গান গাইছিল। আরবি ভাষার গান।

বাড়ি আসতে আসতে জহুর অনেকগুলো বর্ণনা শুনে এল, প্রত্যেকটা বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন, তবে সবার মাঝে একটা বিষয়ে মিল আছে। যে মূর্তিটি দেখা গেছে তার পাখির মতো বড় বড় দুটি পাখা আছে এবং সে পাখা দুটি ঝাপটিয়ে আকাশে উড়ে গেছে।

বাড়ি এসে জহুর সোজাসুজি আনোয়ারার সাথে দেখা করল। আনোয়ারা ফিসফিস করে বলল, "খবর শুনেছ জহুর?"

জহুর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ। শুনেছি।"

আনোয়ারা গলা নামিয়ে বলল, 'কপাল ভালো কেউ চিনতে পারে নাই। চিনতে পারলে যে কী বিপদ হতো!"

জহুর এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "চিনতে না পারলে কী হবে আনোয়ারা বুবু। বিপদ যেটা হবার সেটা কিন্তু হয়েছে।"

আনোয়ারা শুকনো মুখে বলল, "কী বিপদ?"

"চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে যে এইখানে কোনো একজন আকাশে উড়ে। সেই খবর আস্তে আস্তে আরো দূরে যাবে। গ্রামের মানুষ ভাবছে এইটা জিনের বাচ্চা। কিন্তু যারা বুলবুলকে এত দিন ধরে খুঁজছে তারা ঠিকই বুঝবে এইটা জিনের বাচ্চা না। তারা তখন বুলবুলকে ধরে নিতে আসবে।"

"সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ। সর্বনাশ।"

"এখন কী হবে?"

"জানি না। সাবধান থাকতে হবে। খুব সাবধান। এই চরে বাইরের মানুষকে দেখলেই কিন্তু সাবধান।"

আনোয়ারা ভয়ার্ত মুখে দাওয়ায় বসে বলল, "জহুর।"

"বল আনোয়ারা বুবু।"

www.doridro.com

"তুমি বুলবুলকে একটু বুঝিয়ে বল কী হলে কী করতে হবে, একটু সাবধান করে দিও।"

"দিব।"

"আহারে। সোনা বাচ্চাটা আমার।" আনোয়ারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এত বড় পৃথিবী, কিন্তু তার শান্তিতে থাকার কোনো জায়গা নাই।"

www.doridro.com

পরের কয়েক সপ্তাহ জহুর খুব দুশ্চিন্তায় কাটাল, যদিও কেউ তার মুখ দেখে সেটা বুঝতে পারল না, সে শান্তভাবে দৈনন্দিন কাজ করে যেতে লাগল। নৌকার মাঝি হিসেবে দূরে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছিল, জরুরি কাজ বলে খুবই লোভনীয় পারিশ্রমিক দেয়ার কথা কিন্তু জহুর চর ছেড়ে যেতে রাজি হলো না, সে বাড়ির আশপাশে গৃহস্থালি কাজ করে সময় কাটিয়ে দিতে লাগল। জিনের বাচ্চাকে দেখার সেই ঘটনার কথাও ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যায়, এক সময় মানুষ সেটার কথা ভুলে যায় এবং পুরো ব্যাপারটাকে অনেকেই আক্কাস এবং জালালের একটা ঠাট্টা হিসেবে ধরে নেয়। মাসখানেক কেটে যাওয়ার পর জহুরও খুব ধীরে ধীরে খানিকটা দুশ্চিন্তামুক্ত হতে শুরু করে।

ঠিক এ রকম সময় খুব ভোরে চরের ঘাটে একটা স্পিডবোট এসে থামল এবং সেখান থেকে বেশ কয়েকজন মানুষ তীরে নেমে এল। সবার শেষে যে নেমে এল সে হচ্ছে ডক্টর সেলিম। সে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন শুকনো মানুষকে জিজ্ঞেস করল, "এইটা সেই চর?"

শুকনো মানুষটি বলল, "জি স্যার।"

"এইখানে পাখাওয়ালা বাচ্চাটাকে দেখা গেছে?"

"জি স্যার।"

"বাচ্চাটাকে খুঁজে বের করা হয়েছে?"

"জি স্যার। জহুর নামে একটা মানুষের বাচ্চা—"

"জহুর! হ্যাঁ জহুর, ঠিকই বলেছে—মানুষটার নাম ছিল জহুর। এই জহুরের কাছে বাচ্চাটা থাকে?"

"হ্যাঁ। জহুরকে বাবা ডাকে।"

"বাচ্চাটার পাখা—"

"পাখাটা ঢেকে রাখে মনে হয়। পিঠের দিকে উঁচু হয়ে থাকে, সবাই

www.doridro.com

মনে করে কুঁজো। বাচ্চাকে কুঁজা বুলবুল ডাকে।"

ডক্টর সেলিমের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, মাথা নেড়ে বলে, "চমৎকার! আমার হাত থেকে পালাবে ভেবেছিলে? কোথায় পালাবে সোনার চাঁদ।"

"জি স্যার। এখন আর পালানোর কোনো উপায় নেই।"

ডক্টর সেলিম তার ছোট দলটাকে ডাকে, "শোনো তোমরা সবাই।"

মানুষগুলো ডক্টর সেলিমকে ঘিরে দাঁড়াল। ডক্টর সেলিম বলল, "এইটা খুবই ছোট একটা চর, মানুষজন বেশি নাই। আমরা যে এসেছি সেই খবরটা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে যাবে। খবর ছড়িয়ে গেলেই ঝামেলা, জহুর নামের মানুষটা অসম্ভব ডেঞ্জারাস। কোনো কিছুতে ঘাবড়ায় না—কাজেই সে যদি আমাদের খবর পায় তাহলে বিপদ হতে পারে। তাকে প্রথম আটকাও।"

ঘাড় মোটা একজন মানুষ বলল, "আটকাব।"

"শোনো—আগেরবার বাচ্চাটা আমার হাত ফসকে পালিয়ে গেছে। এইবার যেন কিছুতেই না পালায়। জহুরকে আটকাতে হবে। দরকার হলে গুলি করো—পুলিশকে আমি সামলাব।"

ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না।"

"জহুরকে আটকানোর পর খুঁজে বের করো ছেলেটা কোথায় আছে। ধরে নিয়ে আসো এই স্পিডবোটে, কেউ কিছু বোঝার আগে নিয়ে চলে যাব।"

ঘাড় মোটা মানুষটির সাথে সাথে আরো দুজন বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

ডক্টর সেলিম মুখ শক্ত করে বলল, "শোনো। বাচ্চাটাকে জীবন্ত ধরতে হবে। জীবন্ত। মনে থাকবে?"

"মনে থাকবে।"

"কিন্তু যদি তোমরা দেখো তাকে জীবন্ত ধরতে পারছ না, সে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাহলে তাকে মৃত হলেও ধরতে হবে। বুঝেছ?"

"বুঝেছি। জীবিত অথবা মৃত।"

"না।" ডক্টর সেলিম মাথা নাড়ল, "জীবিত অথবা মৃত না। জীবিত এবং জীবিত। কিন্তু যদি দেখা যায় কোনোভাবেই তাকে জীবিত ধরা যাচ্ছে না, তাহলে মৃত। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"ঠিক আছে। কাজে লেগে যাও।"

www.doridro.com

জহুরকে চারজন মানুষ যখন আটক করল তখন সে তার আলকাতরার কৌটা নিয়ে নদীর ঘাটে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার নৌকাটা অনেক দিন থেকে মেরামত করা হয়নি, সে কয়েক দিন আগে টেনে তীরে তুলে এনেছে। এত দিনে সেটা শুকিয়ে গেছে, আজ আলকাতরা দিয়ে লেপ দেয়ার কথা। সে অবশ্যি বাড়ি থেকে বের হতে পারল না, তার আগেই তাকে আটক করা হলো। জহুর প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ করেই দেখল তার সামনে দুজন এবং পেছনে দুজন মানুষ। সে তার পিঠে একটা ধাতব নলের খোঁচা অনুভব করে, শুনতে পায় একজন বলছে, "যদি তুমি কোনো তেড়িবেড়ি করো তাহলে গুলি করে দেব।"

জহুর কীভাবে কীভাবে জানি বুঝে গেল মানুষটা দরকার হলে সত্যিই গুলি করে দেবে, তাই সে নড়ল না। সে হঠাৎ করে তার বুকের মাঝে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে, বুক আগলে সে যে শিশুটিকে বড় করেছে আজকে তার খুব বিপদের দিন। বাচ্চাটি পারবে নিজেকে রক্ষা করতে?

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা কী চাও?"

"তুমি খুব ভালো করে জান, আমরা কী চাই।"

"তোমরা কারা?"

পেছনের মানুষটি তার পেছনে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "তোমার বাবা।"

জহুর বলল, "অ।"

মানুষগুলো জহুরকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল, তারপর একজন জিজ্ঞেস করল, "চিড়িয়াটা কই?"

"বুলবুলের কথা জানতে চাইছ?"

"হ্যাঁ।"

"বুলবুল চিড়িয়া না। সে খুব ভালো একটা ছেলে। আমি তাকে বুকে ধরে মানুষ করেছি।"

মানুষটি হাতের রিভলবারটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তুমি বুকে ধরে মানুষ করেছ না 'ইয়েতে' ধরে মানুষ করেছ, আমরা সেটা জানতে চাই না। আমরা জানতে চাই সে কোথায়?"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে, আগে হোক পরে হোক তারা খোঁজ পেয়ে যাবেই বুলবুল কোথায়। এই রকম সময় সে স্কুলে থাকে। কিন্তু কথাটা সে

www.doridro.com

সরাসরি বলতে চায় না। যদি একটু হইচই হয় একটু গোলাগুলি হয় বুলবুল সেটা শুনতে পেয়ে সতর্ক হতে পারবে। জহুর বলল, "আমি বলব না।"

ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "তুমি বলবে না? তোমার বাবায় বলবে।"

জহুর শীতল চোখে বলল, "ঠিক আছে। তুমি তাহলে আমার বাবাকেই জিজ্ঞেস করো।"

রিভলবার হাতের মানুষটা তার রিভলবারের বাঁট দিয়ে মাথায় মারতে যাচ্ছিল, ঘাড় মোটা মানুষটা তাকে থামাল, বলল, "আগেই মারপিট দরকার নেই। না বলে যাবে কোথায়, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে বাঁকা করতে হবে।"

ঠিক এ রকম সময় একজন মানুষ আনোয়ারাকে টেনে এনে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে বলল, "খবর পাওয়া গেছে।"

"পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ।" মানুষটা বলল, "আমাদের চিড়িয়া স্কুলে গেছে।"

"চিড়িয়া আবার স্কুলেও পড়ে নাকি?"

"হ্যাঁ। চিড়িয়া লেখাপড়া শিখে জজ ব্যারিস্টার হবে।"

কথাটি যেন অত্যন্ত উঁচু দরের রসিকতা এ রকম ভান করে সবাই হা হা করে হাসতে থাকে। ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "হাসি থামা। এই মেয়েলোকটাকে বেঁধে রাখ। দুজন পাহারায় থাক—অন্যেরা আমার সাথে চল স্কুলে।"

রিভলবার হাতে মানুষটা বলল, "হ্যাঁ, দেরি হয়ে যাচ্ছে। স্যার অপেক্ষা করছেন।"

জহুর জিজ্ঞেস করল, "স্যারটা কে?"

ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "সেটা শুনে তুমি কী করবে?"

"ডক্টর সেলিম?"

হঠাৎ করে ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "চুপ কর। চুপ কর তুমি। তা না হলে খুন করে ফেলব।"

জহুর চুপ করে গেল। আনোয়ারা জহুরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এখন কী হবে জহুর?"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আল্লাহ যেটা ঠিক করে রেখেছে সেটাই হবে।"

ঠিক সেই সময় মালবিকা ছোট স্কুলঘরের তালা খুলে দিয়েছে এবং

www.doridro.com

স্কুলের ছেলেমেয়েরা ভেতরে ঢুকে টানাটানি করে হোগলার মাদুরটা বিছিয়ে দিতে শুরু করেছে। কয়েকজন বইপত্র সামনে রাখতে শুরু করে দিল। লিপি তার ছোট ভাইটাকে মাটিতে বসিয়ে তখন জানালাটা খুলে দেয় এবং বাইরে তাকিয়ে উৎফুল্ল মুখে বলল, "স্কুলে সাহেবরা আসছে।"

যে প্রতিষ্ঠানটা এই স্কুলটি এখানে বাসিয়েছে মাঝে মাঝে তাদের কর্মকর্তারা এটা দেখতে আসে, যখনই আসে তখনই তারা বাচ্চাদের জন্যে খাতাপত্র বা গুঁড়োদুধ নিয়ে আসে। কাজেই সাহেবরা স্কুল দেখতে আসছে সেটা নিঃসন্দেহে সবার জন্যে একটা আনন্দ সংবাদ।

মালবিকা অবাক হয়ে বলল, "নাহ! আজকে তো কারো আসার কথা না!"

"আসছে আপা, এই দেখেন।"

মালবিকা জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, "আরে! মানুষগুলোর হাতে বন্দুক! ব্যাপার কী?"

একটা ছেলের চোখ আনন্দে চকচক করে ওঠে, "মনে হয় পাখি শিকার করতে এসেছে!"

"চল দেখি—" বলে কিছু বলার আগেই বাচ্চাগুলো দৌড়ে বের হয়ে যায়। মালবিকা তাদের থামানোর জন্যে একটু চেষ্টা করল কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, সবাই ছুটতে ছুটতে পাখিশিকারি দেখতে বের হয়ে গেছে। মালবিকা বাচ্চাগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্যে পেছনে পেছনে বের হয়ে গেল।

লিপির পাশে দাঁড়িয়ে বুলবুল বাইরে তাকালো এবং হঠাৎ করে তার বুকটা ধ্বক করে ওঠে। কেউ বলে দেয়নি কিন্তু হঠাৎ করে সে বুঝে গেল এই মানুষগুলো আসলে তাকেই ধরতে আসছে। জহুর কয়েক দিন থেকে তাকে এই বিষয়টা নিয়েই সতর্ক করে আসছিল।

বুলবুল নিচু গলায় লিপিকে বলল, "এই মানুষগুলো পাখি শিকার করতে আসে নাই।"

লিপি জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কী শিকার করতে এসেছে?"

"আমাকে।"

"তোকে?" লিপি অবাক হয়ে বলল, "তোকে কেন?"

বুলবুল লিপির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "লিপি! তুই একটা কাজ করতে পারবি?"

www.doridro.com

"কী কাজ?"

বুলবুল তার শার্টটা ততক্ষণে খুলে ফেলেছে, লিপি অবাক হয়ে দেখল শার্টের নিচে কাপড় দিয়ে তার শরীরটা পেঁচানো—পেছনের দিকে খানিকটা উঁচু হয়ে আছে। বুলবুল বলল, "আমার এই কাপড়টা খুলে দিবি? তাড়াতাড়ি?"

"কেন? কাপড় দিয়ে বেঁধে রেখেছিস কেন?"

"আগে খুলে দে তাহলেই বুঝবি—"

লিপি কাপড়ের বাঁধন ঢিলে করতেই বুলবুল ঘুরে ঘুরে পেঁচানো কাপড় খুলতে থাকে এবং দেখতে দেখতে তার পেছনের পাখা বের হয়ে আসে। লিপি ফ্যালফ্যাল করে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, অনেক কষ্ট করে বলে, "তুই—তুই—"

"হ্যাঁ। লিপি তোকে বলেছিলাম না ছেলে পরীর কথা? আমি ছেলে পরী—"

লিপি আবার বলল, "তুই তুই তুই—"

"হ্যাঁ আমি। ঐ মানুষগুলো আমাকে ধরতে আসছে।"

"তোর পাখা আছে? আসলে তুই কুঁজা না?"

"না আমি কুঁজা না। আমার পাখা আছে।"

"তুই উড়তে পারিস?"

"হ্যাঁ আমি উড়তে পারি। ঐ মানুষগুলো যখন আমাকে ধরতে আসবে তখন আমি উড়ে যাব।"

"সত্যি?"

"উড়ে কোথায় যাবি।"

"জানি না।"

"আর কোনো দিন আসবি না?"

বুলবুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কেমন করে আসব? এখন তো সবাই জেনে যাবে আমি আসলে মানুষ না।" হঠাৎ করে বুলবুলের মুখটাকে করুণ এবং বিষণ্ণ মনে হয়।

লিপি কিছুক্ষণ বুলবুলের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, "তুই তাহলে কী?"

"আমি জানি না। আমি যদি মানুষ হতাম তাহলে কি কেউ কোনো দিন আমাকে ধরে নিতে আসত?"

www.doridro.com

লিপি অবাক হয়ে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, আস্তে করে তার পাখায় হাত বুলিয়ে বিস্ময়ের গলায় বলল, "কি সুন্দর!"

"সুন্দর?"

"হ্যাঁ। সুন্দর।" লিপি আস্তে আস্তে বলল, "তুই আগে কেন কোনো দিন আমাকে বললি না?"

"যদি সবাই জেনে যেত?"

লিপি মাথা নেড়ে বলল, "আমি কাউকে বলতাম না।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

বুলবুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি বুঝি নাই। যদি বুঝতাম তাহলে বলতাম।"

লিপি আবার মাথা নাড়ল, বলল, "বলতাম না। কাউকে বলতাম না।"

বুলবুল জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে বলল, "মানুষগুলো এসে গেছে।"

"হ্যাঁ।"

"আমি এবারে জানালা দিয়ে বাইরে যাব। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

জানালাটা অনেক উপরে, বুলবুল হাত দিয়ে ধরে যখন ওঠার চেষ্টা করল তখন লিপি তাকে ধাক্কা দিয়ে সাহায্য করল। সে অবাক হয়ে দেখল বুলবুলের শরীরটা পাখির পালকের মতো হালকা।

বুলবুল জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ার সাথে সাথে মানুষগুলো ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "কোথায়? বুলবুল কোথায়?"

লিপি কথার কোনো উত্তর দিল না। তার ছোট ভাইটাকে মাটি থেকে কোলে তুলে নিল। মানুষটা তখন ধমক দিয়ে বলল, "কোথায়?"

লিপি বলল, "নাই।"

"নাই মানে? কোথায় গেছে?"

"আমি জানি না।"

মানুষগুলো অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে লিপির দিকে তাকিয়ে থাকে। একজন জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো, তারপরেই চিৎকার করে বলল, "বাইরে! বাইরে! কুইক।"

www.doridro.com

সবাই বাইরে ছুটে যায় এবং সেখানে তারা একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখতে পায়। মাঠের মাঝখানে বুলবুল খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার পেছন থেকে পাখির ডানার মতো দুটি ডানা বের হয়ে এসেছে। বুলবুলের চেহারায় এক ধরনের বিষণ্নতার ছাপ, সে যেন অনেকটা অন্যমনস্কভাবে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষগুলো তাদের বন্দুক উদ্যত করে বুলবুলকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল, বুলবুলকে সেটা নিয়ে খুব চিন্তিত মনে হলো না।

মানুষগুলো যখন আরেকটু এগিয়ে আসে তখন বুলবুল হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হয়ে উপরে লাফ দেয় এবং প্রায় সাথে সাথে তার পাখা দুটি ঝাপটা দিয়ে ওঠে।

ভাইকে কোলে নিয়ে লিপি, তার স্কুলের বন্ধুরা, মালবিকা এবং বন্দুক হাতের মানুষগুলো অবাক হয়ে দেখল বিশাল একটা পাখির মতো বুলবুল আকাশে উড়ে যাচ্ছে!

মোটা ঘাড়ের মানুষটা চিৎকার করে বলল, "ধর! ধর!"

তার কথা শুনে মানুষগুলো লাফিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করে কিন্তু ততক্ষণে বুলবুল অনেক উপরে উঠে গেছে। মোটা ঘাড়ের মানুষটা চিৎকার করে বলল, "গুলি কর! গুলি!"

বন্দুক হাতের মানুষটা বন্দুকটা তুলে বুলবুলের দিকে তাক করে। ঠিক যখন সে ট্রিগারটা টেনে ধরবে তখন কোথা থেকে জানি লিপি ছুটে এসে বন্দুক হাতের মানুষটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড গুলির শব্দে পুরো এলাকাটা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে কিন্তু অল্পের জন্যে গুলিটা বুলবুলের গায়ে না লেগে ফস্কে গেল।

এক সাথে কয়েকজন এসে লিপিকে ধরে টেনে ছুড়ে ফেলে দেয়, ছোট ভাইটা কোল থেকে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। বন্দুক হাতের মানুষটা আবার আকাশের দিকে তার বন্দুকটা তাক করল তখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা স্কুলের ছেলেগুলো এসে সেই মানুষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দ্বিতীয় গুলিটাও তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ততক্ষণে বুলবুল অনেক দূরে সরে গেছে।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বিশাল একটা পাখির মতো বুলবুল উড়ে যাচ্ছে। ভোরের সূর্যের আলো পড়ে তার পাখা দুটো চিকচিক করছে।

www.doridro.com

জহুরের সামনে ডক্টর সেলিম কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড ক্রোধে তার মুখটা খানিকটা বিকৃত হয়ে আছে। সে মাটিতে পা দাপিয়ে বলল, "কোথায় গেছে? বল কোথায় গেছে?"

জহুর খুব বেশি হাসে না। এবারে সে মুখে জোর করে একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আপনার ধারণা আমি আপনাকে বলব সে কোথায় গেছে?"

ডক্টর সেলিম চোখ লাল করে বলল, "তোমাকে আমি খুন করে ফেলব।"

জহুর কষ্ট করে মুখে হাসি ধরে রেখে বলল, "বরং সেইটাই করে ফেলেন! আপনার জন্যে সেইটা কঠিন না, তিন সপ্তাহের বাচ্চাকে যে খুন করতে পারে আমার মতো বুড়া হাবড়াকে খুন করতে তার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না!"

"তুমি ভাবছ আমি মশকরা করছি?"

"না। আমি সেটা ভাবছি না। তবে—"

"তবে কী?"

"চরের মানুষেরা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। আমাকে খুন করতে চাইলে আরো মানুষের ভিড় হওয়ার আগে করে ফেলেন। তারপর তাড়াতাড়ি পালান। তা না হলে এই চরের মানুষেরা কিন্তু আপনাদের সবাইকে চরের বালুর মাঝে পুঁতে ফেলতে পারে। বাইরের মানুষ খবরও পাবে না।"

ডক্টর সেলিম হঠাৎ করে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে চোখের কোনা দিয়ে তাকায়, সত্যি সত্যি পাথরের মতো মুখ করে মানুষজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ডক্টর সেলিম আবার জহুরের দিকে তাকালো, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তুমি আমার প্রাইজটা নিয়ে একবার পালিয়েছ! আমার দশ বছর লেগেছে তোমাকে খুঁজে বের করতে! আমি আবার তোমাকে আর তোমার চিড়িয়াকে খুঁজে বের করব!"

"আরো দশ বছর পর?" জহুর আবারো সত্যি সত্যি হেসে ফেলল, বলল, "দশ বছরে আমার ছোট বুলবুল একটা জওয়ান মানুষ হবে। তখন আমাকে আর তাকে দেখে রাখতে হবে না, আমার বুলবুল নিজেই তোমার

www.doridro.com

ঘাড়টা কটাস করে ভেঙে দেবে।”

ডক্টর সেলিম বিস্ফারিত চোখে জহুরের দিকে তাকিয়ে রইল। পাশে দাঁড়ানো মোটা ঘাড়ের মানুষটা রিভলবারের বাঁট উঁচু করে জহুরের মাথায় মারার জন্যে এগিয়ে আসছিল, ডক্টর সেলিম তাকে থামাল। নিচু গলায় বলল, “এখন ঝামেলা করো না। ঘাটে চলো।”

নদীর ঘাটে পৌঁছানোর আগেই তারা দেখতে পায় তাদের স্পিডবোটটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিছু মানুষ তাদের বোটটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, পেট্রোলের ট্যাংকটা তাদের চোখের সামনেই সশব্দে ফেটে গেল। মাথা ঘুরিয়ে তারা তীরের দিকে তাকালো, দেখল চরের মানুষজন আস্তে আস্তে ঘাটের দিকে আসছে। সবার সামনে হালকা পাতলা ছোট একটা মেয়ে, কোলে ছোট একটা বাচ্চা।

অনেক দূর থেকেই ডক্টর সেলিম ছোট মেয়েটির চোখের প্রবল ঘৃণাটুকু বুঝতে পারে। সে ঘুরে কাঁপা গলায় বলল, “বন্দুকে গুলি আছে তো?”

“আছে।”

“কতগুলো।”

“যথেষ্ট।”

ডক্টর সেলিম দরদর করে ঘামতে থাকে, সে ঠিক বুঝতে পারছিল না ঠিক কতগুলো গুলি হলে সেটাকে যথেষ্ট বলা যাবে।

www.doridro.com

নৌকাটাকে টেনে উপরে তুলে জহুর চাঁদের আলোতে তীরে উঠে এলো। চাপা গলায় ডাকল, "বুলবুল!"

নির্জন চরে তার গলার স্বর অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায়। কোনো উত্তর না পেয়ে সে আবার ডাকল, এবার আরেকটু গলা উঁচিয়ে, "বুলবুল!"

একটু দূরে বড় একটা ঝাপড়া গাছের ওপর কিছু একটা নড়ে ওঠে, সেখান থেকে অতিকায় একটা পাখির মতো ভেসে ভেসে বুলবুল নামতে থাকে, জহুরের মাথার ওপর দুই পাক ঘুরে সে নিচে নেমে আসে। তারপর ছুটে জহুরের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "বাবা! এসেছ?"

"হ্যাঁ বাবা। এসেছি।"

"এত দেরি করলে কেন?"

"দেরি করি নাই বাবা। আমি এর আগে আসতে পারতাম না। তোকে নিয়ে কত হইচই হয়েছে জানিস? শহর থেকে কত সাংবাদিক এসেছে। টেলিভিশন ক্যামেরা এসেছে। সবাই আমাকে চোখে চোখে রাখছে। তাই আমি ঘর থেকে বের হই নাই। বলেছি তুই কোথায় গেছিস আমি জানি না। যখন সবার উত্তেজনা কমেছে, সবাই চলে গেছে তখন এসেছি।"

"ঐ খারাপ লোকগুলোর কী হয়েছে বাবা?"

জহুর একটু হাসার ভঙ্গি করল, বলল, "গ্রামের মানুষগুলো ধরে যা পিটুনি দিয়েছে সেটা বলার মতো না। স্পিডবোট জ্বালিয়ে দিয়েছে। লিডার কে ছিল জানিস?"

"কে বাবা?"

"তোদের স্কুলের মেয়ে লিপি! এইটুকুন মেয়ে তার কী সাহস! রিভলবার বন্দুক নিয়েও কেউ পালাতে পারে নাই! মনে হয় দুই-চারজনের হাত-পাও ভেঙেছে।" জহুর সুর পাল্টে বলল, "যাই হোক, তোর কোনো সমস্যা হয় নাই তো?"

www.doridro.com

"না বাবা।"

"আমি তোর জন্যে পানি, শুকনা চিঁড়া আর গুড় রেখে গিয়েছিলাম।"

"জানি বাবা। আমি খুঁজে খুঁজে বের করেছি।"

বুলবুল হেসে যোগ করল, "গুড়ের মাঝে পিঁপড়া ধরেছিল, এছাড়া কোনো সমস্যা হয় নাই।"

"কত দিন তুই ভালো করে খাস নাই! আনোয়ারা বুবু তোর জন্যে রান্না করে দিয়েছে। আয় খাবি। খুব খিদে পেয়েছে তাই না?"

"না বাবা খিদে পায় নাই। আমি উড়ে উড়ে গাছের ওপর থেকে ফল ফুল খেতে পারি। পেট ভরে যায়।"

"তাহলে তো ভালো।"

"হ্যাঁ বাবা, তুমি বলেছিলে মনে নাই? আমার একা একা থাকা অভ্যাস করতে হবে। আমি অভ্যাস করেছি।"

জহুর খুব সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল, "অভ্যাস হচ্ছে?"

"হ্যাঁ বাবা। হচ্ছে।"

"থাকতে পারবি?"

"পারব।"

জহুর বুলবুলকে গভীর মমতায় নিজের কাছে টেনে আনে। মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলে, "বাবা বুলবুল! আমি মানুষকে বিশ্বাস করতে পারি না! তোদের স্কুলের লিপির মতো ছোট মেয়ে আছে যে খুব সহজে তোকে মেনে নেবে। আবার শহরের অনেক বড় বড় অনেক বিখ্যাত, অনেক ক্ষমতাবান মানুষ আছে যারা মেনে নেবে না, যারা তোকে পেলেই ধরে খাঁচায় বন্ধ করবে, কেটে কুটে দেখবে। বিদেশে বিক্রি করে দেবে। সেই জন্যে আমি তোকে মানুষের সামনে নিতে চাই না।"

"আমি জানি বাবা। তুমি আমাকে বলেছ।"

জহুর বুলবুলের মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, "আমি অনেক চিন্তা করেছি বাবা। তোর পাখাগুলো যদি কেটে ফেলা হতো—"

বুলবুল মাথা নাড়ল, বলল, "না বাবা! আমি পাখা কেটে মানুষ হতে চাই না বাবা। আমি পাখা নিয়ে পাখি থাকতে চাই।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "আমি সেটা বুঝতে পেরেছি। সেই জন্যেই বলেছি, মানুষের মাঝে তোকে রাখা যাবে না। কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে

www.doridro.com

পাখাগুলো আর কত দিন ঢেকে রাখব?"

"হ্যাঁ বাবা, আমার খুব কষ্ট হতো। এখন আমার কোনো কষ্ট হয় না। আমি যখন আকাশে উড়ি আমার কী যে ভালো লাগে!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ বাবা। আমার যখন পাখায় আরো জোর হবে, তখন আমি তোমাকে পিঠে নিয়ে একদিন আকাশে উড়ব। তুমি দেখো—"

জহুর হাসির মতো এক ধরনের শব্দ করল। বলল, "মাথা খারাপ হয়েছে? আমি তাহলে ভয়ে হার্টফেল করেই মরে যাব।"

"কোনো ভয় নেই বাবা—"

"তোর কোনো ভয় নেই। তোর পাখা আছে, তুই উড়তে পারিস। আমার অনেক ভয়!"

"উপর থেকে সবকিছু দেখতে খুব ভালো লাগে। মনে হয় সবকিছু সমান! সবকিছু সুন্দর! আর কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"মনে হয় আমার কোনো ভয় নাই। কেউ আমাকে কিছু করতে পারবে না।"

"সেটা তো সত্যি কথা! তুই যদি আকাশে উড়িস তাহলে কে তোকে কী করবে? কে তোকে ছুঁবে? কে তোকে ধরবে?"

বুলবুল হাসার মতো একটু শব্দ করল।

নৌকার গলুইয়ে বসে বুলবুল অনেক দিন পরে ভাত খেল। আনোয়ারা অনেক যত্ন করে সবকিছু রেঁধে দিয়েছে, জহুর সেগুলো তুলে তুলে বুলবুলকে খাইয়ে দিল। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আমি এখন যাই?"

"যাও বাবা।"

"তুই একলা থাকতে পারবি তো?"

"আমি একলা একলা আছি না?"

"কোথায় ঘুমাস?"

"ঐ যে ঝাপড়া গাছটা দেখছ? সেটার উপর?"

"গাছের উপর?"

"হ্যাঁ, কোনো অসুবিধে হয় না।"

"ভয় লাগে রাতের বেলা?"

www.doridro.com

বুলবুল ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "কেন বাবা? ভয় কেন লাগবে?"

"তুই এইটুকুন মানুষ, এই চরের মাঝে একা একা—"

"আমি একা থাকি না বাবা?"

"তাহলে তোর সাথে কে থাকে?"

"ঐ গাছটাতে কত পাখি থাকে তুমি জানো?"

"পাখি?"

"হ্যাঁ সত্যিকার পাখি। পাখিরা আমাকে খুব ভালোবাসে।"

"ভালোবাসে?"

"হ্যাঁ। আমার সাথে উড়ে বেড়ায়। খেলে।"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কী আশ্চর্য!"

"আসলে আশ্চর্য না, এইটাই স্বাভাবিক বাবা।"

জহুর অবাক হয়ে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে রইল, এইটুকুন ছোট বাচ্চা কী সুন্দর বড় মানুষের মতো কথা বলছে। মনে হচ্ছে কয়েক দিনেই সে বড় হয়ে গেছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে জহুর বলল, "ঠিক আছে বাবা। আমি তাহলে যাই। এই যে পোঁটলাটা রাখ। কাঁথা কম্বল আছে। খাবার আছে—পানি আছে। এক টুকরা সাবান আছে।"

বুলবুল পোঁটলাটা হাতে নিয়ে বলল, "আমার কিছু লাগবে না বাবা! আমি এমনিতেই ভালো আছি।"

"না লাগলেও সাথে রাখ"

জহুর নৌকাটা ঠেলে পানিতে নামাতে নামাতে বলল, "বাবা বুলবুল।"

"বলো বাবা।"

"আমি এর পরের বার যখন আসব তখন তোকে নিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে।"

"দুই থেকে তিন সপ্তাহ লাগবে যেতে—সুন্দরবন অনেক দূর।"

"জানি বাবা, তুমি বলেছ।"

"গহিন অরণ্য, সেখানে তুই আর আমি থাকব।"

"হ্যাঁ, বাবা। অনেক মজা হবে।"

"কোনো মানুষ তোকে আর খুঁজে পাবে না।"

"হ্যাঁ। আমি পাখিদের সাথে পাখি হয়ে থাকব।"

www.doridro.com

জহুর লগি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকাটাকে পানিতে নামিয়ে দেয়। স্রোতের টানে নৌকাটা তরতর করে এগিয়ে যায়। সে পেছনে ফিরে দেখে নদীর তীরে বুলবুল দাঁড়িয়ে আছে। জোছনার আলোতে তাকে কেমন যেন অবাস্তব স্বপ্নের মতো দেখায়।

ঠিক কী কারণ জানা নেই জহুরের বুকটা গভীর বেদনায় ভরে আসে।

www.doridro.com

তৃতীয় পর্ব

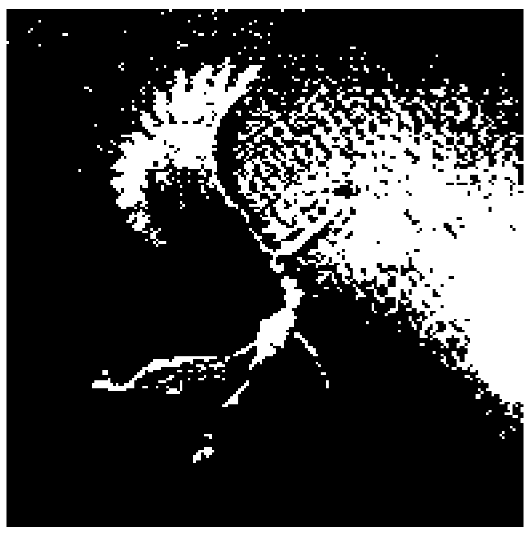

প্রতিদিন সকালে বুলবুলের ঘুম ভাঙে পাখির ডাক শুনে। সেই সূর্য ওঠার আগে পাখিগুলো তার ঘরের চারপাশে ভিড় জমিয়ে কিচিরমিচির করে ডাকতে থাকে। শুধু কিচিরমিচির করে ডেকেই তারা ক্ষান্ত হয় না, ঘরের ভেতর ঢুকে তার শরীরের ওপর চেপে বসে, তিড়িংবিড়িং করে লাফায়, ঠোঁট দিয়ে ঠোকর দেয়। তাকে জাগানোর চেষ্টা করে।

আজকেও যখন ছোট ছোট পাখি তাকে জাগানোর চেষ্টা করল বুলবুল চোখ খুলে তাকালো এবং সাথে সাথে পাখিগুলোর উত্তেজনা বেড়ে যায়, তারা দুই পায়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লাফাতে থাকে, কিচিরমিচির করে ডাকতে থাকে। বুলবুল বিড়বিড় করে বলল, "তোমাদের সমস্যাটা কী? এত কিচিরমিচির করছ কেন?"

বুলবুলকে কথা বলতে দেখে পাখিগুলো আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তারা আরো দ্রুত ছোটাছুটি করতে থাকে। তখন বুলবুল উঠে বসল এবং পাখিগুলোর মাঝে বিশাল একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। তাদের কিচিরমিচির ডাকে তখন সেখানে কান পাতা দায় হয়ে গেল। বুলবুল একবার চোখ কচলায়, হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙে এবং তারপর বিড়বিড় করে বলে, "যেখানে আমি নাই সেখানে পাখিরা কী করে বলবে আমাকে?"

পাখিগুলো তার কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারে না কিন্তু হালকা সুরটুকু বুঝতে পারে। তারা উড়ে উড়ে তার ঘাড়ে মাথায় হাতে বসে একটানা কিচিরমিচির করতে থাকে। বুলবুল তখন তার ঘর থেকে বের হয়ে গাছের বড় ডালে এসে দাঁড়িয়ে তার পাখা দুটো বিস্তৃত করে দিয়ে একবার ডানা ঝাপটিয়ে বলল, "চল তাহলে, দিনটা শুরু করি।"

বুলবুলের কুচকুচে কালো চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ। সে তার দুটো পাখা ছড়িয়ে দিয়ে গাছের উঁচু ডাল থেকে শূন্যে ঝাঁপ

www.doridro.com

দেয়, নিচে নামতে নামতে হঠাৎ করে সে ডানা ঝাপটিয়ে উপরে উঠতে থাকে, তার সাথে সাথে শত শত নানা আকারের পাখি কিচিরমিচির শব্দ করে উড়তে থাকে। বুলবুল সোজা উড়ে গিয়ে ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করে নিচে নেমে আসতে থাকে, নদীর পানিতে নেমে আসার আগে সে সতর্ক চোখে চারপাশে একবার দেখা নেয়, বনের পশুরা এখানে রাতে পানি খেতে আসে।

পানিতে মুখ ধুয়ে সে সামনে এগিয়ে যায়, তীরের কাদামাটিতে বুনো পশুর পায়ের ছাপ। বেশির ভাগই হরিণ—তার মাঝে আলাদা করে একটা বাঘের পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। একটা বাঘিনী, নতুন বাচ্চা হয়েছে—এই এলাকার আশপাশেই থাকে। নদীর পানিতে ছলাৎ ছলাৎ করে হেঁটে বুলবুল মাছ ধরার খাঁচাটা টেনে পানি থেকে তুলল। মাঝারি আকারের একটা মাছ ছটফট করছে, উপরে তুলতেই ভোরবেলার সূর্যের নরম আলোতে তার শরীরটা চিকচিক করতে থাকে। বুলবুল মাছটা খাঁচা থেকে বের করে তীরে উঠে আসে, নদীর মাঝামাঝি একটা কুমির পুরানো গাছের গুঁড়ির মতো ভেসে ছিল, সেটা এবার ধীরে ধীরে তীরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

পাখিগুলো নদীর পানিতে ঝাপটাঝাপটি করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা মাটি খুঁটে খুঁটে কিছু খেতে চেষ্টা করে। বুলবুল ডানা ঝাপটিয়ে উপরে ওঠার সাথে সাথে পাখিগুলোও তার সাথে আবার উড়তে শুরু করে।

বনের মাঝামাঝি ফাঁকা একটা জায়গায় বুলবুল তার আগুনটা জ্বালিয়ে রাখে, উপরের ছাই সরিয়ে সে গনগনে জ্বলন্ত কয়লা বের করে তার ওপর মাছটা বসিয়ে দেয়। মাছটা আধপোড়া না হওয়া পর্যন্ত সে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। পাখিগুলো আশপাশে গাছের ডালে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের কিচিরমিচির শুনতে শুনতে সে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ করে সব পাখি কিচিরমিচিড় শব্দ করে একসাথে উড়তে শুরু করে, বুলবুল সাথে সাথে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে যায়—কিছু একটা আসছে।

কী আসছে সেটা প্রায় সাথে সাথেই দেখা গেল। জঙ্গলের এই এলাকার বাঘিনীটা খুব ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে, তার পেছনে পেছনে তিনটা ছোট ছোট বাঘের বাচ্চা। বাঘিনীটা কাছাকাছি এসে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় ঘরঘর এক ধরনের শব্দ করল, সেই শব্দে কোনো আক্রোশ বা সতর্কবাণী নেই, নেহায়েতই পরিচিত কোনো প্রাণীর প্রতি এক ধরনের

www.doridro.com

সম্ভাষণ। বাঘিনীটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত বুলবুল সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রয়োজন হলে মুহূর্তের মাঝে ডানা ঝাপটিয়ে সে উপরে উঠে যেতে পারবে, কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না।

বাঘিনীটা চলে যাওয়ার পর বুলবুল জ্বলন্ত কয়লা থেকে মাছটা বের করে ওপর থেকে পোড়া আঁশ সরিয়ে ভেতরের সেদ্ধ হয়ে থাকা নরম মাছটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকে। সে একা থাকে, দীর্ঘ সাত বছর কেউ তাকে দেখেনি সে জন্যেই কি না কে জানে তার আচার-আচরণে এক ধরনের বন্য ভাব চলে এসেছে।

জহুর যে কয়দিন বেঁচে ছিল সব সময় তাকে বলেছে, "বুলবুল বাবা, তুই এই জঙ্গলে একা একা থাকবি, তোর আশপাশে কোনো মানুষ থাকবে না। থাকবে বুনো পশু, কিন্তু মনে রাখিস, তোর শরীরে কিন্তু মানুষের রক্ত আছে। তোকে কিন্তু বুনো হওয়া চলবে না।" বুলবুল সে জন্যে সব সময় তার কোমরে এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে রাখে! সাত বছর আগের কাপড়, শতচ্ছিন্ন কিন্তু তবুও কাপড়!

খাওয়া শেষ করে বুলবুল তার আগুনটার মাঝে কিছু শুকনো কাঠ গুঁজে দিল, তারপর সেটা ঢেকে দিয়ে বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে। গহিন অরণ্য কিন্তু সে পুরো এলাকাটাকে একেবারে হাতের তালুর মতো চেনে। প্রত্যেকটা গাছ, প্রত্যেকটা ঝোপঝাড়, লতাগুল্মকে সে একটু একটু করে বড় হতে দেখেছে। বনের পশুগুলোও তার চেনা, সাপ গোসাপ কীটপতঙ্গগুলোও মনে হয় বুঝি পরিচিত।

হাঁটতে হাঁটতে সে উপরে তাকালো, এখানে গাছের ডালে বিশাল একটা মৌচাক। সেখানে মৌমাছির মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কোনো একদিন রাতে এসে সে মৌচাকের খানিকটা ভেঙে নিয়ে যাবে। মধু খেতে তার ভারী ভালো লাগে।

পায়ে হেঁটে বনের মাঝে ঘুরে বেড়াতে তার আবার জহুরের কথা মনে হলো, জহুর তাকে বলেছিল, মানুষের শরীর খুব আজব ব্যাপার। এর যেটাকে যত ব্যবহার করা যায় সেটা তত শক্তিশালী হয়। সেই জন্যে তাকে বারবার বলত, তুই কিন্তু শুধু উড়ে বেড়াবি না, তুই হাঁটবি, দৌড়াবি! তাহলে পা শক্ত থাকবে! জহুর বলত, সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করবি মাথা, তাহলে

www.doridro.com

বুদ্ধি বাড়বে। পশু-পাখি বেঁচে থাকে অভ্যাসের কারণে, মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় বুদ্ধি দিয়ে।

বুলবুলের মনে আছে সে জিজ্ঞেস করেছিল, "বাবা, আমি কি মানুষ?"

জহুর এক মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে বলেছিল, "যার শরীরে এক ফোঁটাও মানুষের রক্ত থাকে সেই মানুষ।"

বুলবুল ভেবেছিল সে তখন জিজ্ঞেস করবে, তাহলে আমি কেন মানুষের সাথে থাকতে পারি না? কিন্তু সে সেটা জিজ্ঞেস করেনি। জিজ্ঞেস করলে জহুর কষ্ট পাবে, সে জন্যে জিজ্ঞেস করেনি। সে কখনোই জহুরকে কষ্ট দিতে চায়নি।

বুলবুল হেঁটে হেঁটে খালের কিনারায় এল। জোয়ারের সময় খালটা পানিতে কানায় কানায় ভরে যায়। এখন ভাটির টান এসেছে, খালটার পানি বলতে গেলে নেই। বুলবুল খালের কিনারায় খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে সেখানে কিছু ফুলগাছ লাগিয়েছে—হরিণেরা এসে মাঝে মাঝেই ফুলসহ তার গাছ খেয়ে যায়—বুলবুল অবশ্যি কিছু মনে করে না। এই জঙ্গলে কোনো কিছুই কারো জন্যে নির্দিষ্ট নয়। সবকিছুই সবার জন্যে। বুলবুল তার ফুলগাছগুলো দেখে আরেকটু সামনে তার বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ দেখতে পেল। জহুর তাকে এটা শিখিয়েছিল। জহুর নাকি শিখেছিল একজন ডাকাতের কাছে। সেই ডাকাত জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল বারো বছর, জঙ্গলে কেমন করে বেঁচে থাকতে হয় সে তার সব কায়দাকানুন জানত।

বুলবুলের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিয়মটা খুব সোজা। মাটির মাঝে গর্ত করে তার উপরে একটা প্লাস্টিক বিছিয়ে রাখা। মাটি থেকে যে জলীয় বাষ্প বের হয় সেটা প্লাস্টিকের ওপর একত্র হয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে ছোট একটা পাত্রে জমা হয়। জঙ্গলের বুনো একটা গাছের শক্ত খোল দিয়ে সে বাটি বানিয়েছে। সেই বাটিতে এই পানি জমা হয়। বুলবুল বাটি বের করে ঢকঢক করে পানিটা খেয়ে আবার ঠিক জায়গায় রেখে দেয়। এই বিশুদ্ধ পানি না হলেও তার আজকাল অসুবিধা হয় না, সে নদীর নোনাপানিও খেতে পারে। শুধু নোনাপানি নয়, সে যা কিছু খেতে পারে তার কখনো শরীর খারাপ হয় না। জীবনে তার জ্বর হয়নি, সর্দি কাশি কিছু হয়নি। তার শরীর কেটে গেলেও কখনো ইনফেকশন হয় না। জহুর দেখে দেখে অবাক হয়ে বলত, "আমার কী মনে হয় জানিস?"

"কী বাবা?"

www.doridro.com

"তোর শরীরটা নিশ্চয়ই অন্য রকম কিছু দিয়ে তৈরি। তাই রোগজীবাণু তোকে ধরে না। তোর অসুখ হয় না।"

বুলবুল বলত, "অসুখ হলে কেমন লাগে বাবা?"

জহুর হাসার চেষ্টা করে বলত, "সেটা জানিস না খুব ভালো কথা। জানার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?"

জহুরের শেষের দিকে খুব অসুখ হতো। এই জঙ্গলে তার শরীরটা টিকত না, খুব অসুস্থ হয়ে সে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকত। গভীর রাতে বুলবুলের যখন ঘুম ভাঙত সে দেখত ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে জহুর তার দিকে তাকিয়ে আছে। বুলবুল ঘুম ঘুম গলায় জিজ্ঞেস করত, "কী দেখো বাবা?"

জহুর নিঃশ্বাস ফেলে বলত, "তোকে দেখি।"

"আমাকে কী দেখো?"

"কাজটা ঠিক করলাম কি না সেটা দেখি।"

"কোন কাজটা বাবা?"

"এই যে তোকে ছোটবেলা বাঁচিয়ে তুলেছি। বাঁচিয়ে তুলে কি ভুল করলাম? তোর মায়ের সাথে তোকেও কি চলে যেতে দেয়া উচিত ছিল?"

বুলবুল তখন বলে, "না বাবা। ভুল করোনি।"

"ঠিক বলছিস? তোকে বাঁচিয়ে রেখে শুধু কি কষ্ট দিচ্ছি?"

"না বাবা। মোটেও কষ্ট দাওনি। তুমি খুব ভালো কাজ করেছ।"

"আর এখন? এই জঙ্গলে? একা একা?"

"এটা সবচেয়ে ভালো হয়েছে বাবা। আমি একেবারে স্বাধীনভাবে উড়তে পারি, ঘুরতে পারি!"

জহুর ইতস্তত করে বলত, "তুই যে একা!"

"কে বলেছে একা? এই তো তুমি আছ!"

জহুর নিঃশ্বাস ফেলে বলত, "আমি আর কদিন। আমি টের পাচ্ছি আমার ডাক এসেছে।"

বুলবুল বুঝতে পারেনি সত্যি সত্যি তার ডাক এসেছে। একদিন ভোরবেলা জহুর বলল, "বাবা বুলবুল।"

বুলবুল বলল, "কী বাবা।"

জহুর বলল, "আজকে খুব একটা বিশেষ দিন।"

"কেন বাবা?"

"আজকে আমি যাব।"

www.doridro.com

"কোথায় যাবে বাবা?"

জহুর হাসার চেষ্টা করে বলল, "যেখান থেকে ডাক এসেছে, সেখানে।"

বুলবুল চমকে উঠে বলেছিল, "না বাবা।"

জহুর বলেছিল, "হ্যাঁ।" তারপর তার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, "আয় আমাকে সাহায্য কর।"

বুলবুল তখন চোখ মুছে তাকে সাহায্য করেছিল। খালের মাঝে যে নৌকাটা ছিল, জহুর সেই নৌকাটার মাঝে গিয়ে শুয়েছিল। বুলবুলকে বলেছিল, "বাবা নৌকার লগি দিয়ে একটা ধাক্কা দে।"

বুলবুল লগি দিয়ে নৌকাটাকে ধাক্কা দিতেই সেটা খালের মাঝখানে চলে এল। ভাটির টানে সেটা তরতর করে এগুতে থাকে। জহুর চিৎ হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, "নৌকাটা খাল থেকে যাবে নদীতে, নদী থেকে যাবে সমুদ্রে। সমুদ্রে যেতে যেতে আমি আর থাকব না।"

বুলবুল জহুরের হাত ধরে থাকল, জহুর বলল, "একটু পরে আমি আর কথা বলতে পারব না, তখন তুই চলে যাস বাবা।"

বুলবুল বলল, "না বাবা, আমি যেতে চাই না।"

"তোকে যেতে হবে। কেউ সারা জীবন থাকে না। একদিন তুইও থাকবি না।"

"না বাবা—"

"না বলে না বোকা ছেলে। নৌকাটা বেশি দূরে যাবার আগে তুই চলে যাবি। সমুদ্রে জেলে নৌকা থাকে, তোকে পরে দেখে ফেলবে।"

বুলবুল কোনো কথা বলল না। জহুর বলল, "তুই আমাকে মাপ করে দিস বাবা, তোকে আমি সুন্দর একটা জীবন দিতে পারলাম না।"

বুলবুল বলল, "তুমি আমাকে অনেক সুন্দর জীবন দিয়েছ।"

"তুই তো একা একা থাকবি, কিন্তু তাই বলে তুই কিন্তু বন্য হয়ে যাবি না।"

"হব না।"

"তোকে যেন কোনো দিন কোনো মানুষ খুঁজে না পায়। কিন্তু যদি কখনো পেয়ে যায় তাহলে তুই কিন্তু খুব সাহসী মানুষ হবি। খুব ভালো মানুষ হবি। খুব হৃদয়বান মানুষ হবি।"

"হব।"

www.doridro.com

"হৃদয়বান আর দয়ালু।"

"হব বাবা।"

"কেউ যেন বলতে না পারে জহুর তার ছেলেটাকে জংলি একটা ছেলে বানিয়েছে। নিষ্ঠুর একটা ছেলে বানিয়েছে।"

বুলবুল বলল, "বলবে না বাবা।"

জহুর তখন বুলবুলের হাত ধরে বলল, "তুই এখন যা বাবা।"

বুলবুল চোখ মুছে বলল, "আমি যেতে চাই না।"

"তোকে যেতে হবে। আমি চাই না আমি যখন মারা যাই তখন তুই থাকিস। আমি চাই—"

"কী চাও বাবা?"

"আমি চাই তুই আমাকে জীবন্ত মানুষ হিসেবে মনে রাখিস।"

বুলবুল তখন তার বাবার গলায় বুকে নিজের মুখ স্পর্শ করে বিদায় নিয়ে নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়েছে, তারপর একবারও পেছনে না তাকিয়ে উড়ে গেছে। বুলবুলের এখনো সেই মুহূর্তটির কথা মনে পড়ে। সাত বছর আগের ঘটনা, কিন্তু তার মনে হয় এই সেদিনের ঘটনা।

বুলবুল নদীর তীরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর দুই পাখা বিস্তৃত করে ধীরে ধীরে আকাশে উড়ে যায়। ঘুরে ঘুরে সে উপরে উঠতে থাকে, নিচের বনভূমি ছোট হয়ে আসে, বহু দূরের সমুদ্রতট আবছাভাবে ভেসে ওঠে, বাতাসে এক ধরনের হিমেল স্পর্শ পায়, তবুও সে থামে না, সে উপরে উঠতেই থাকে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করে মেঘ ভেদ করে সে আকাশে উড়ে যাবে, আকাশের অন্য পাশে কী আছে সে দেখবে।

সন্ধ্যে হওয়ার আগেই সে তার ঘরটাতে ফিরে আসে। বিশাল গাছের ডালগুলোর ওপর তৈরি করা ছবির মতো ঘর। কাঠের মেঝেতে শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি বিছানা। বুলবুল সেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার বাঁশিটা বাজায়। বুনো একটা গাছের নল কেটে সে একটা বাঁশি তৈরি করেছে, ফুঁ দিলে মধুর এক ধরনের শব্দ বের হয়। বুলবুল শুয়ে শুয়ে সেই বাঁশিতে সুর তোলার চেষ্টা করে। প্রচলিত কোনো সুর নয়—অনেকটা কান্নার মতো বিচিত্র এক ধরনের সুর। তার ছোট কাঠের ঘরের ফাঁক ফোকরে বসে থাকা পাখিগুলো গুটিশুটি মেরে বসে বসে বুলবুলের বাঁশির সুর শোনে।

www.doridro.com

ঠিক এভাবে বুলবুলের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন নয়, অত্যন্ত বিচিত্র এবং চমকপ্রদ একটা জীবন। কিন্তু প্রতিটা দিনই ছিল একই রকম বিচিত্র এবং একই রকম চমকপ্রদ। বুলবুলের মাঝে মাঝে মনে হতো, জীবনটা কি একটু অন্য রকম হতে পারে না?

সে জানত না, সত্যি সত্যি তার জীবনটা একটু অন্য রকম হয়ে যাবে তার নিজের অজান্তেই।

www.doridro.com

গভীর রাতে ইঞ্জিনের একটা চাপা শব্দে বুলবুলের ঘুম ভেঙে গেল। মাঝে মাঝে এ রকম হয়, কোনো একটা ট্রলার, কোনো একটা স্পিডবোট কাছাকাছি কোনো একটা নদী দিয়ে যায়, সে তার ঘরে বসে তার শব্দ শুনতে পায়। বিশাল একটা গাছের একেবারে উপরে তার ঘর। তাই অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে আসে। শব্দগুলো বাড়ে-কমে, তারপর একসময় ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হতে হতে দূরে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু ইঞ্জিনের এই শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল না। শব্দটা বাড়তে থাকে, কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে কাছাকাছি এগিয়ে আসতে থাকে। বুলবুলের একবার মনে হলো সে উড়ে গিয়ে দেখে আসে কীসের শব্দ, কোথায় আসছে কিন্তু শেষপর্যন্ত রাতের অন্ধকারে তার আর বের হওয়ার ইচ্ছে করল না।

যে ইঞ্জিনের শব্দ শুনে বুলবুলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সেটি আসছিল একটা মাঝারি আকারের লঞ্চ থেকে। লঞ্চটি ভাড়া করেছে পাখি-বিশেষজ্ঞ ডক্টর আশরাফ। সুন্দরবনের পাখি বৈচিত্র্যের একটা পরিসংখ্যান নেয়ার জন্যে সে তার ছোট একটা দল নিয়ে এসেছে। দলের মাঝে বেমানান সদস্যটি হচ্ছে ডক্টর আশরাফের চৌদ্দ বছরের মেয়ে মিথিলা।

গভীর রাতে বুলবুল যখন একটা ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছিল তখন এই লঞ্চের বড় কেবিনটাতে একটা ছোট নাটক অভিনীত হচ্ছিল, নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী ডক্টর আশরাফ আর মিথিলা, বাবা আর মেয়ে।

ডক্টর আশরাফ ক্রুদ্ধ চোখে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলছিল, "তোর হয়েছেটা কী? সারাক্ষণ মুখটা ভোঁতা করে বসে থাকিস?"

মিথিলা বাবার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলল, "আই অ্যাম সরি যে খোদা আমাকে এমন ভোঁতা মুখ দিয়ে জন্ম দিয়েছে।"

www.doridro.com

"মানুষ ভোঁতা মুখ নিয়ে জন্ম নেয় না। মানুষ মুখ ভোঁতা করে রাখে।"

"আব্বু, আমি এখানে আসতে চাইনি, তুমি আমাকে জোর করে এনেছ। এখন তুমি বলছ আমাকে জোর করে আনন্দ পেতে হবে?"

ডক্টর আশরাফ চোখ কপালে তুলে বলল, "জোর করে? জোর করে কেন হবে? সুন্দরবন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। পৃথিবীর মানুষ এটাকে এক নজর দেখার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হয়ে যায়—"

"আব্বু! তুমি অনেক বড় বৈজ্ঞানিক হতে পার কিন্তু তুমি খুব সোজা সোজা কিছু জিনিস জান না।"

"কী জিনিস জানি না?"

"একা একা কেউ কোনো কিছু উপভোগ করতে পারে না। আমি এখানে একা। একেবারে একা।"

"একা? লঞ্চভর্তি মানুষ। আমার স্টুডেন্ট রিসার্চার—"

"হ্যাঁ, লঞ্চভর্তি মানুষ—তোমার স্টুডেন্ট রিসার্চার সবাই তোমার কথায় উঠে-বসে। তুমি তাদের বেতন দাও, তারা তোমার চাকরি করে। তোমার রেফারেন্স পেলে তারা বড় ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পায়। সারাক্ষণ তারা তোমার তোয়াজ করে, তোমাকে খুশি করার জন্যে আমাকেও তোয়াজ করে। এই রকম মানুষদের নিয়ে তুমি খুশি আছ, খুব ভালো কথা। আমাকে খুশি হতে বলো না।"

ডক্টর আশরাফ কঠিন মুখে বলল, "তোদের সমস্যা কি জানিস? তোরা বেশি বুঝিস।"

"আই অ্যাম সরি আব্বু—কিন্তু আমরা বেশি বুঝি না। আমাদের যেটুকু বোঝার কথা ঠিক ততটুকু বুঝি। কিন্তু তোমাদের সমস্যা কি জানো? তোমরা আমাদের কিছুই বোঝ না। তোমাদের ধারণা তোমরা যেটা বোঝ সেটাই ঠিক আর আমাদের সবাইকেই সেটা বুঝতে হবে।"

"কখন আমি সেটা করেছি?"

"এই যে তুমি ধরেই নিয়েছ, এই লঞ্চে করে এক গাদা মানুষের সাথে এই জঙ্গলে এলে আমার খুব আনন্দ পেতে হবে! আই অ্যাম সরি আব্বু, আমি আনন্দ পাচ্ছি না। কিন্তু তুমি যদি চাও এখন থেকে আমি মুখে আনন্দ আনন্দ একটা ভাব করে রাখব।" কথা শেষ করে মিথিলা তার মুখে একটা কৃত্রিম হাসির ভান করল।

ডক্টর আশরাফের ইচ্ছে করল মেয়ের গালে একটা চড় দিয়ে তার

www.doridro.com

মুখের এই টিটকারির হাসিটি মুছে দেয়। কিন্তু সে অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখল। মিথিলার মা মারা যাওয়ার পর সে তার মেয়েটিকে ঠিক করে মানুষ করতে পারেনি। মেয়েটি উদ্ধত দুর্বীনিত হয়ে বড় হচ্ছে। শুধু যে উদ্ধত আর দুর্বীনিত তা নয়, মিথিলা অসম্ভব আবেগপ্রবণ। অত্যন্ত সহজ সাধারণ কথায় সে রেগে ওঠে, বিচলিত হয়ে যায়। চোখ থেকে পানি বের হয়ে আসে। নিজের জগতের বাইরে যে একটা জগৎ থাকতে পারে সেটা সে জানে না, জানার কোনো আগ্রহও নেই। ডক্টর আশরাফ মাঝে মাঝে তার স্ত্রী সুলতানার ওপর এক ধরনের ক্ষোভ অনুভব করে, কেন এত অল্প বয়সে এ রকম একটি মেয়েকে রেখে মরে গেল? ডক্টর আশরাফ নিজের কাজকর্ম গবেষণা নিয়ে নিজে ব্যস্ত থেকেছে, মেয়েটি কেমন করে বড় হচ্ছে সেটি লক্ষ করেনি। যখন লক্ষ করেছে তখন দেরি হয়ে গেছে। এখন এই মেয়েটিকে কোনো দিন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বলে মনে হয় না।

রাত্রি বেলা লঞ্চের কেবিনে নিজের ঘরে মিথিলা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেল। চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ের জগৎটি খুব বিচিত্র, খুব নিঃসঙ্গ এবং একাকী।

পরের দিনটি বুলবুল শুরু করল খুব সতর্কভাবে। আকাশে না উড়ে সে বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে গেল এবং গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখল নদীর মাঝামাঝি একটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। বুলবুল বহুদিন লঞ্চ নৌকা কিছু দেখেনি—সে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। লঞ্চের ভেতর মানুষগুলো ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে, বুলবুল একসময় দেখল মানুষগুলো একটা নৌকায় করে তীরের দিকে আসছে। নৌকাটা তীরে পৌঁছানোর আগেই বুলবুল বনের আরো গভীরে সরে যাচ্ছিল, তখন সে দেখতে পেল প্রায় তার বয়সী একটা মেয়ে কেবিন থেকে বের হয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এত দূর থেকে ভালো করে চেহারা দেখা যায় না কিন্তু তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটির মাঝে এক ধরনের দুঃখী দুঃখী ভাব রয়েছে। বুলবুল এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডক্টর আশরাফের দলটি নদীর তীর ঘেঁষে হেঁটে হেঁটে সারাটি দিন বনের ভেতর ঘুরে বেড়াল। তারা পাখির ছবি তুলল, ভিডিও করল, কাগজে নোট নিল। বাইনোকুলারে তারা দূর থেকে পাখিগুলোকে লক্ষ করল, তাদের

www.doridro.com

সংখ্যা গুনল, পাখির বাসা খুঁজে বের করার চেষ্টা করল, তাদের খাবার পরীক্ষা করে দেখল। মাঝে মাঝেই তারা দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের ভেতর উত্তপ্ত আলোচনা করতে লাগল। দলটার সাথে দুজন মানুষ ছিল রাইফেল নিয়ে, তারা চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল, নদীর তীরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছে, কখন কী ঘটে যায় কেউ বলতে পারে না।

দলটির কেউ অবশ্যি টের পেল না, দূর থেকে আরো অনেক সতর্ক হয়ে তাদের ওপর চোখ রাখছিল বুলবুল। ডক্টর আশরাফ কিংবা তার দলের অন্য কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত যে এখানে সতেরো বছরের একটি কিশোর থাকে, দুই পাখা মেলে সে আকাশে উড়ে যেতে পারে তাহলে নিশ্চিতভাবেই তারা তাদের ক্যামেরা নোটবই বাইনোকুলার সব কিছু ছুড়ে ফেলে শুধু তাকে এক নজর দেখার জন্যে ছুটে আসত।

বুলবুলের আজকের দিনটি হলো খাপছাড়া, একদিকে দূর থেকে এই দলটির ওপর চোখ রাখছে, আবার সুযোগ পেলে নদীর তীরে গিয়ে লঞ্চের পাশে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক কী কারণ জানা নেই লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা উদাসী মেয়েটিকে আরো এক নজর দেখার জন্যে তার এক ধরনের কৌতূহল হচ্ছিল। কত দিন সে কোনো মানুষ দেখে না, কত দিন সে কোনো মানুষের সাথে কথা বলে না!

সূর্য ডুবে যাওয়ার অনেক আগেই পাখি পর্যবেক্ষকরা লঞ্চে ফিরে গেল। বুলবুল তখন কিছু একটা খেয়ে নেয়—সারা দিনের উত্তেজনায় তার খাওয়ার কথাই মনে ছিল না। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর সে নদীর তীরে একটা উঁচু গাছে উঠে বসে, লঞ্চটাকে এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, অস্পষ্টভাবে মানুষের কথাবার্তা, হাসাহাসি শোনা যায়।

রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে লঞ্চের মানুষগুলোর কথাবার্তা কমতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত এক সময় নীরব হয়ে আসে। বুলবুল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তারপর খুব সাবধানে ডানা ঝাপটিয়ে সে উড়তে থাকে, প্রথমে অনেক দূর দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে আসে, তারপর বৃত্তটা ছোট করে, খুব সাবধানে উড়ে উড়ে সে লঞ্চের ছাদে নামল। কয়েক মুহূর্ত সে চুপচাপ বসে থাকে, যখন নিশ্চিত হলো যে কেউ তাকে দেখে ফেলেনি তখন সে খুব সাবধানে ছাদ থেকে তার মাথাটি নিচে দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। ঠিক কী দেখার চেষ্টা

www.doridro.com

করবে নিজেই বুঝতে পারছিল না, তখন সে উত্তেজিত গলার স্বর শুনতে পেল। বুলবুল সরে গিয়ে যে কেবিন থেকে উত্তেজিত স্বর ভেসে আসছে সেখানে উঁকি দিয়ে ডক্টর আশরাফকে দেখতে পেল। ডক্টর আশরাফ হাত নেড়ে বলছে, "আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, একজন মানুষ কিছু না করে বিছানায় শুয়ে কেমন করে দিন কাটাতে পারে।"

বুলবুল শুনতে পেল কেবিনের অন্য পাশ থেকে মিথিলা বলছে, "আমাকে আমার মতো থাকতে দাও আব্বু।"

মিথিলার গলার স্বরে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ। বুলবুল একটু সরে গিয়ে মেয়েটিকে দেখার চেষ্টা করল। আজ ভোরে সে এই মেয়েটিকে লঞ্চের রেলিং ধরে বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। ডক্টর আশরাফ কঠিন গলায় বলল, "আমি তো তোকে তোর মতোই থাকতে দিচ্ছি।"

"না আব্বু। তুমি আমাকে আমার মতো থাকতে দিচ্ছ না। তুমি আমাকে বিরক্ত করছ।"

মিথিলার কথা শুনে ডক্টর আশরাফ কেমন যেন ক্ষেপে গেল, চিৎকার করে বলল, "আমি বিরক্ত করছি? যদি শুনতে পাই আমার মহারানী মেয়ে সারা দিন না খেয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল, আমি যদি সেই খবর নিতে আসি, তাহলে সেটা বিরক্ত করা হয়?"

"হ্যাঁ আব্বু হয়। তোমার এটা আগে চিন্তা করা উচিত ছিল, আমার যখন খেতে ইচ্ছে করে না, আমি তখন খাই না। বাসায় তুমি সেটা জান না—কারণ তুমি বাসায় থাকো না।"

ডক্টর আশরাফ কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না, তারপর থমথমে মুখে বলল, "আমি কোনো ঢং দেখতে চাই না। খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর।"

"আমার খিদে নেই।"

"একজন মানুষ সারা দিন না খেয়ে থাকলে তার খিদে থাকে না কেমন করে?"

"আমি সেটা জানি না। কিন্তু আমার খিদে নেই।"

"আমাকে রাগাবি না, মিথিলা। আমি অনেক সহ্য করেছি।"

"কেন আব্বু? তুমি কী করবে? তুমি কি আমাকে মারবে নাকি?'

"দিন রাত মুখটাকে এমন ভোঁতা করে রাখবি—তোকে তো মারাই উচিত। কখনো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটাকে একবার দেখেছিস?"

www.doridro.com

মিথিলা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, "আই অ্যাম সরি আব্বু, আমার চেহারাটা খারাপ। আম্মু তো মরে গেছে—তোমার আর ঝামেলা নাই। তোমার সুন্দরী একজন কলিগকে বিয়ে করো, তোমার বাচ্চাগুলোর চেহারা যেন ভালো হয়।" .

"কী বললি? কী বললি তুই?" বলে ডক্টর আশরাফ এগিয়ে গিয়ে তার মেয়ের গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মেরে বলল, "তোর এত বড় সাহস? তুই আমার সাথে এভাবে কথা বলিস?"

মিথিলা প্রস্তুত ছিল না, সে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, কোনোমতে সে উঠে দাঁড়িয়ে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তার বাবার দিকে তাকায়। সে যতটুকু রাগ হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি অবাক হয়েছে। যতটুকু অবাক হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছে। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন এখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। মিথিলা বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে তার বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ফিসফিস করে বলল, "তুমি আমাকে মারতে পারলে আব্বু?"

ডক্টর আশরাফ কোনো কথা না বলে হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মিথিলা এবার ফিসফিস করে বলল, "ঠিক আছে আব্বু। গুড বাই।"

ডক্টর আশরাফ তখনো রাগে কাঁপছিল, সে কেবিন থেকে বের হয়ে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকে সশব্দে তার দরজা বন্ধ করে দিল।

বুলবুল নিজের ভেতরে এক ধরনের অপরাধবোধ অনুভব করে, তার মনে হতে থাকে এভাবে লুকিয়ে বাবা আর মেয়ের এ রকম ব্যক্তিগত একটা ঘটনা তার দেখা উচিত হয়নি। কত দিন সে কোনো মানুষ দেখে না, লুকিয়ে সে তাদের দেখতে এসেছিল। কিন্তু তাই বলে মানুষের এ রকম ব্যবহার? বাবার সাথে মেয়ের? মেয়ের সাথে বাবার?

বুলবুলের মনটা খারাপ হয়ে যায়, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, ঠিক যখন সে উড়ে যাবে তখন হঠাৎ করে নিচে দরজা খোলার শব্দ হলো, বুলবুল তখন মাথা নিচু করে তাকালো। দেখতে পেল মিথিলা তার কেবিন থেকে বের হয়ে এসেছে, ওপর থেকে তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার হাঁটার ভঙ্গিটুকু স্বাভাবিক নয়। অনেকটা অপ্রকৃতিস্থের মতো সামনে হেঁটে যায়। কয়েক মুহূর্ত রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ সে রেলিংয়ের ওপর উঠে দাঁড়ায়, তারপর কিছু বোঝার আগেই সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

DORIDRO.COM

www.doridro.com

বুলবুল কিছু চিন্তা করার সময় পেল না, সে ঠিক একই গতিতে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং মিথিলা নদীর পানি স্পর্শ করার আগের মুহূর্তে তাকে খপ করে ধরে ফেলল। তারপর তার বিশাল ডানা ঝাপটে সে উড়ে আসে, বৃত্তাকারে ঘুরে সে লঞ্চের ছাদে ফিরে এসে সাবধানে তাকে ছাদে নামিয়ে দিল।

মিথিলার কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে এবং শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারে যে আসলে সে পানিতে ডুবে যায়নি, একেবারে শেষ মুহূর্তে তাকে কেউ ধরে ফেলেছে, তাকে নিরাপদে ছাদে নামিয়ে দিয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব মিথিলা কোনোভাবেই বুঝতে পারছিল না, সে হকচকিত হয়ে তখনো তাকিয়ে ছিল। জোছনার আলোতে সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, সামনে বিস্ময়কর একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়—কারণ সে জোছনার আলোতে স্পষ্ট দেখতে পারছে তার বিশাল দুটি পাখা। মিথিলা কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তুমি কে?"

বুলবুল কোনো উত্তর দিল না। সে কী উত্তর দেবে? সে কী বলবে, আমার নাম বুলবুল? আমি একই সাথে মানুষ এবং পাখি। আমি এই বনে একা একা উড়ে বেড়াই? সে কেমন করে এই মেয়েটিকে বলবে সে কে?

মিথিলা আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? তুমি কেন আমাকে বাঁচিয়েছ?"

বুলবুল তখনো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। মিথিলা আরেকটু এগিয়ে এসে বুলবুলকে আরেকটু কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করে। তারপর ফিসফিস করে বলে, "তুমি কি মানুষ?"

বুলবুল এবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি না।"

"তুমি জান না?"

বুলবুল মাথা নাড়ে। "না।"

মিথিলা তার হাতটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বুলবুলকে স্পর্শ করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন আমাকে বাঁচিয়েছ?"

"আমার মা একদিন তোমার মতো পানিতে লাফ দিয়েছিল। তখন একজন তাকে বাঁচিয়েছিল, সেই জন্যে আমি এখনো আছি।" বুলবুল নিচু গলায় বলল, "একদিন তুমিও কারো মা হবে। বেঁচে না থাকলে কেমন করে হবে?"

মিথিলা অবাক হয়ে এই বিস্ময়কর ছায়ামূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

www.doridro.com

গলার স্বর একজন কম বয়সী কিশোরের মতো। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "আমাকে বাঁচানোর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।"

বুলবুল কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। মিথিলা নিচু গলায় বলে, "এর পরের বার কি তুমি আমাকে বাঁচাবে?"

বুলবুল হাসির মতো শব্দ করল, বলল, "এরপরের বার তুমি কখনো এটা করবে না। কখনো না।"

"কেন না?"

"তাহলে আমি খুব কষ্ট পাব।"

"কেন তুমি কষ্ট পাবে? তুমি আগে আমাকে কখনো দেখো নাই।"

"বড় হওয়ার পর আমি কোনো মানুষ দেখি নাই। তুমি প্রথম। তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ো না। তুমি যখন চলে যাবে তখন আমি তোমার কথা মনে রাখব।"

ঠিক এ রকম সময় ডক্টর আশরাফ তার কেবিন থেকে বের হয়ে এল, মেয়ের গায়ে হাত তোলার আগের মুহূর্তে তার ভেতর ছিল ভয়ঙ্কর ক্রোধ। এখন ক্রোধের বদলে সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে তীব্র অপরাধবোধ। অভিমানী মেয়ে রাগে-দুঃখে কিছু একটা করে ফেললে কী হবে? সে মেয়ের কেবিনের সামনে গিয়ে ডাকল, "মিথিলা—"

কেবিনের দরজা হাট করে খোলা, ভেতরে কেউ নেই, হঠাৎ করে তার বুকটা ধ্বক করে ওঠে, সে পাগলের মতো বের হয়ে আসে, এদিক-সেদিক তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকে, "মিথিলা! মিথিলা-মা।"

লঞ্চের ছাদে বুলবুল হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, মিথিলাকে ফিসফিস করে বলল, "আমি যাই! তুমি আমার কথা কাউকে বলো না!"

তারপর তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তার বিশাল দুটি ডানা মেলে সে আকাশে উড়ে গেল। মিথিলা অবাক হয়ে দেখল বিশাল একটা পাখির মতো ডানা মেলে একজন আকাশে উড়ে যাচ্ছে, চাঁদের আলোতে তাকে কী বিচিত্রই না দেখাচ্ছে!

নিচে থেকে সে আবার তার বাবার ব্যাকুল গলার আওয়াজ শুনতে পেল, "মিথিলা–মিথিলা—"

মিথিলা লঞ্চের ছাদ থেকে বলল, "বাবা! এই যে আমি।"

"কোথায়?"

"লঞ্চের ছাদে।"

www.doridro.com

ডক্টর আশরাফ সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে আসে, দেখে জোছনার আলোতে তার মেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মিথিলা মা, তুই এখানে?"

"হ্যাঁ আব্বু।"

"হঠাৎ করে মনে হলো তুই তুই—তুই বুঝি—"

"আমি কী?"

"না কিছু না।" ডক্টর আশরাফ মেয়েকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, "আই অ্যাম সরি মা, আমি তোর গায়ে হাত তুলেছি। তুই আমাকে মাপ করে দে।"

মিথিলা বলল, "ছিঃ! আব্বু! তুমি কী বলছ?"

ডক্টর আশরাফ নরম গলায় বলল, "আর কখনো হবে না মা। তোকে আমি কথা দিচ্ছি—"

মিথিলা নিচু গলায় বলল, "আমিও কথা দিচ্ছি।"

"কী কথা দিচ্ছিস?"

"আমি আর কখনো রাগ করব না। মন খারাপ করব না—"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি। আমি খুব বোকা একটা মেয়ে আব্বু। আমি আর বোকা থাকব না আব্বু।"

ডক্টর আশরাফ অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকাল, বলল, "কী হয়েছে তোর মিথিলা?"

"জানি না আব্বু আমার কী হয়েছে। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ আমার কিছু একটা হয়েছে। আমার কী মনে হচ্ছে জান?"

"কী মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে আমি আর ছোট মেয়ে না। মনে হচ্ছে আমি বড় হয়ে গেছি। অনেক বড় হয়ে গেছি।"

ডক্টর আশরাফ অবাক হয়ে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

www.doridro.com

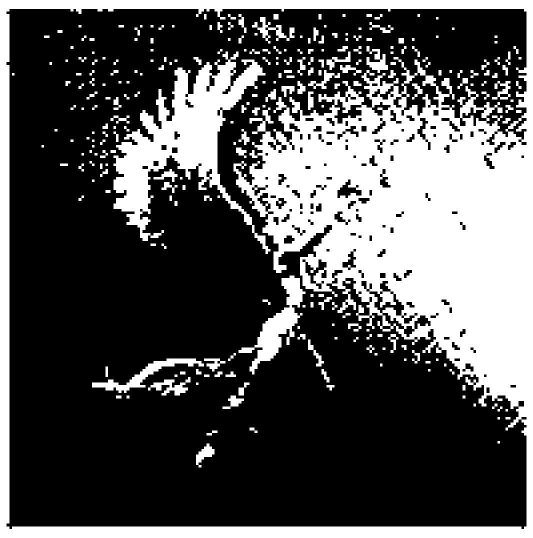

মিথিলার পরিবর্তনটা পরদিন সবাই লক্ষ করল। সে সকালবেলা সবার আগে কাপড় জামা পরে প্রস্তুত হয়ে গেছে। মাথায় কাপড়ের একটা টুপি, চোখে কালো চশমা। পিঠে একটা ব্যাগ এবং গলায় বাইনোকুলার। নৌকা তীরে এসে নেমে কাদার ভেতর দিয়ে ছপছপ করে হেঁটে সে ডাঙ্গায় উঠে এল। পুরো দলটির পেছনে পেছনে সে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াল, গুনগুন করে একটা ইংরেজি গানের সুর গাইত গাইতে বাইনোকুলার লাগিয়ে সে সব গাছের ওপর দিয়ে নিজের অজান্তেই কিছু একটা খুঁজে বেড়াতে লাগল।

ডক্টর আশরাফ একটু অবাক হয়ে মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কী দেখিস গাছের ওপর?"

"কিছু না আব্বু। এমনি দেখি।"

"চোখ খোলা রাখলে দেখিস কত কী দেখা যায়।"

মিথিলা হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল, "আমরা যদি উড়তে পারতাম তাহলে কী মজা হতো তাই না আব্বু!"

"তোকে কে বলেছে আমরা উড়তে পারি না! প্লেনে হেলিকপ্টারে আমরা উড়ি না!"

মিথিলা মাথা নেড়ে বলল, "না, না, না! আমি ঐ রকম উড়ার মতো বলছি না। সত্যিকার উড়ার কথা বলছি। পাখির মতো উড়ার কথা বলছি!"

"পাখি রয়েছে বিবর্তনের শেষ মাথায়, আমরাও রয়েছি শেষ মাথায়। আমাদের উড়ার কথা থাকলে এতদিনে আমরা পাখি হয়ে যেতাম!"

মিথিলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের যদি পাখা থাকত তাহলে কী মজা হতো তাই না?"

ডক্টর আশরাফ হাসল, বলল, "আমাদের যত ওজন আমাদের উড়তে হলে যে পাখা লাগবে, শরীরে সেই পাখা লাগানোর জায়গাই থাকবে না! শুধু পাখাই থাকতে হবে–শরীর আর থাকবে না!"

www.doridro.com

মিথিলা ভুরু কুঁচকে চিন্তা করে। ডক্টর আশরাফ জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবিস?"

"তাহলে আমাদের শরীরটা হালকা হতে হবে?"

"হ্যাঁ। পাখির যে রকম। হাড়গুলো হালকা, বিশাল ফুসফুস। মেদহীন ছিপছিপে শরীর!"

মিথিলা কোনো কথা বলল না, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাইনোকুলারটা চোখে লাগিয়ে আবার সে গাছগুলোর ওপর দিয়ে দেখতে লাগল। দূরে কোথাও এক জায়গায় হঠাৎ করে অসংখ্য পাখি কিচিরমিচির করে ডাকতে ডাকতে তাদের মাথায় ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ডক্টর আশরাফদের দলের লোকজন বিস্মিত হয়ে সেই পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। কোথা থেকে হঠাৎ করে এতগুলো পাখি এসেছে? কোথায় যাচ্ছে?

রাত্রি বেলা অনেক দিন পর মিথিলা সবার সাথে বসে খেলো, গল্পগুজব করল এবং একজন যখন তাকে একটা গান গাইতে বলল সে একটুও সংকোচ না করে একটা ইংরেজি গান গেয়ে শোনাল। ডক্টর আশরাফ এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। এক রাতের মাঝে মেয়েটির মাঝে এ রকম একটা পরিবর্তন হবে কে জানত!

রাত্রি বেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে গেছে তখন মিথিলা খুব সাবধানে তার কেবিন খুলে বের হয়ে এল। কেউ যেন বুঝতে না পারে সেভাবে নিঃশব্দে সে লঞ্চের ছাদে এসে দাঁড়াল। জোছনার আলোতে পুরো বনভূমিটিকে একটি অতিপ্রাকৃত ভূখণ্ডের মতো মনে হয়। অনেক দূর থেকে কোনো একটা বুনো পশু ডাকতে থাকে, এক ধরনের বিষণ্ন করুণ কণ্ঠস্বর মনে হয়, শুনে মিথিলার বুকের মাঝে এক ধরনের কষ্ট হতে থাকে।

মিথিলা লঞ্চের ছাদে হাঁটতে থাকে, তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। কালকের সেই রহস্যময় ডানাওয়ালা কিশোরিটি কি আসবে আবার? যখন হেঁটে হেঁটে একসময় সে ক্লান্ত হয়ে গেল, মনে হলো আর বুঝি সে আসবে না তখন সে দেখতে পায় আকাশে বৃত্তাকারে কিছু একটা উড়ছে। বিশাল ডানা ঝাপটিয়ে উড়তে উড়তে সেই রহস্যময় ছায়ামূর্তিটি কাছে আসতে থাকে।

মিথিলা দুই হাত উপরে তুলে নাড়তে থাকে, তখন খুব ধীরে ধীরে

www.doridro.com

বুলবুল ডানা মেলে প্রায় নিঃশব্দে নিচে নেমে আসে। মিথিলা কাছে গিয়ে বুলবুলকে স্পর্শ করে বলল, "আমি বুঝেছিলাম তুমি নিশ্চয়ই আসবে!"

বুলবুল বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, "কী সুন্দর জোছনা উঠেছে, আমি তাই উড়তে বের হয়েছি। ভাবলাম তোমাদের লঞ্চটা দেখে যাই। তখন দেখি তুমি ছাদে দাঁড়িয়ে আছ, তাই এসেছি।"

"আমি না হয়ে যদি অন্য কেউ হতো?"

"আমি বুঝতে পেরেছি অন্য কেউ না। তোমরা যখন আজ জঙ্গলে গিয়েছিলে আমি তোমাদের সবাইকে দেখেছি!"

"দেখেছ?"

"হ্যাঁ।" মিথিলা হেসে ফেলল, বলল, "আমি বাইনোকুলার দিয়ে তোমাকে সবগুলো গাছের উপর খুঁজেছিলাম।"

বুলবুল মাথা নেড়ে বলল, "তোমরা কখনো খুঁজে আমাকে পাবে না। আমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারি। তোমরা আমাকে দেখবে না, কিন্তু আমি তোমাদের দেখি।"

"কী মজা!"

"শুধু পাখিগুলো মাঝে মাঝে ঝামেলা করে।"

"কী ঝামেলা করে?"

"হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে যায়। ডাকাডাকি করে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়।"

মিথিলা চোখ বড় বড় করে বলল, "ও আচ্ছা! বনের মাঝে হঠাৎ করে অনেকগুলো পাখি উড়ে উড়ে এল—"

"হ্যাঁ। ওগুলো আমার সাথে ছিল। ওরা আমার ঘরে ঘুমায়।"

"তোমার ঘর? তোমার ঘর কোথায়?"

"জঙ্গলে অনেক উঁচু একটা গাছের ওপর আমি ঘর তৈরি করছি।"

"ইশ! কী মজা।"

বুলবুল কোনো কথা বলল না, নির্জন বনভূমিতে উঁচু একটা গাছের উপরে ছোট একটা কাঠের ঘরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত একেবারে একা একা থাকা সত্যিই খুব মজার কি না বুলবুল কখনোই সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি। কিন্তু সে কোনো কথা বলল না।

মিথিলা জোছনার আলোতে কিছুক্ষণ বুলবুলের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ইশ! তোমার কী মজা তুমি উড়তে

www.doridro.com

পার।”

“তুমি উড়তে চাও?”

“চাই না আবার? এক শ বার উড়তে চাই।”

“তুমি আমার সাথে উড়বে?”

মিথিলা অবাক হয়ে বলল, “উড়ব? তোমার সাথে?”

“হ্যাঁ।”

“কেমন করে?”

“তুমি আমার পিঠে বসবে, আমি তোমাকে নিয়ে উড়ে যাব।”

“সত্যি? তুমি পারবে?”

“কেন পারব না?”

মিথিলার চোখ চকচক করে ওঠে, ইতস্তত করে বলল, “কিন্তু-কিন্তু-”

“কিন্তু কী?”

“যদি পড়ে যাই?”

বুলবুল হেসে ফেলল, বলল, “পড়বে না। তুমি যখন পড়তে চেয়েছিলে তখনো আমি তোমাকে পড়তে দেই নাই। মনে আছে?”

মিথিলা একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, “মনে আছে।”

“আমি তোমাকে পড়তে দিব না, আর তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখবে।”

“ঠিক আছে।” মিথিলা এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

বুলবুল তার দুই ডানা বিস্তৃত করে একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। মিথিলা পেছন থেকে তার গলা ধরে তার পিঠে ঝুলে পড়ল। বুলবুল জিজ্ঞেস করল, “তুমি ঠিক করে ধরেছ?”

“ধরেছি।”

“ঠিক আছে তাহলে আমরা উড়ছি।”

বুলবুল তার শক্তিশালী ডানা দুটি ঝাপটে সামনে কয়েক পা এগিয়ে পা দিয়ে নিচে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠে পড়ে। মিথিলা শক্ত করে বুলবুলের গলা চেপে ধরে ভয়ের একটা শব্দ করল, প্রথমে বুলবুল খানিকটা নিচে নেমে আসে তারপর খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে। ডানা ঝাপটে বুলবুল মিথিলাকে নিয়ে বনভূমির দিকে উড়ে যায়, গাছের উপর দিয়ে সে আকাশের দিকে এগুতে থাকে, দেখে মনে হয় সে বুঝি সোজা চাঁদের দিকে এগিয়ে

www.doridro.com

যাচ্ছে।

বুলবুল জিজ্ঞেস করল, "তুমি ঠিক আছ?"

মিথিলা বলল, "হ্যাঁ। ঠিক আছি। তুমি?"

"আমিও ঠিক আছি।"

"তুমি কোথায় যাবে বল?"

"তোমার যেখানে ইচ্ছা।"

বুলবুল ডানা ঝাপটে মিথিলাকে আরো উপরে নিয়ে যায়। মিথিলা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে নিচে তাকিয়ে থাকে। জোছনার আলোতে নিচের বনভূমিকে রহস্যময় মনে হয়। ছোট ছোট খাল, নদী বনভূমিকে জড়িয়ে রেখেছে, জোছনার আলোতে সেগুলো চিকচিক করছে। চারপাশে নিস্তব্ধ, এতটুকু শব্দ নেই, তার মাঝে পাশ দিয়ে হঠাৎ একটা রাতজাগা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। মিথিলা চমকে উঠল, "ওটা কী?"

"আমার বন্ধু।"

"তোমার বন্ধু?"

"হ্যাঁ। মাঝে মাঝে অনেক রাতে আমি যখন আকাশে উড়ি তখন সে আমার সাথে সাথে ওড়ে!"

"কী মজা! সব পাখি তোমার বন্ধু?"

"হ্যাঁ সব পাখি আমার বন্ধু। আমি ওদের দেখে-শুনে রাখি। ওরা খুব ভালো। ওরাও আমাকে দেখে-শুনে রাখে।"

মিথিলা বুলবুলের গলা জড়িয়ে ধরে তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে নিচে তাকায়। তার ভেতরে অত্যন্ত বিচিত্র এক ধরনের অনুভূতির জন্ম হয়, যে অনুভূতির সাথে তার পরিচয় নেই। সে ফিসফিস করে বলল, "আমার কী মনে হচ্ছে জান?"

"কী?"

"আমার মনে হচ্ছে আমি সারা জীবন এখানে থেকে যাই। আমার কী যে ভালো লাগছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।"

"আমি জানি তুমি এখানে থাকবে না। কেমন করে থাকবে? থাকার কোনো উপায় নাই। আমার থাকতে হয় তাই থাকি। তা না হলে কি আমি থাকতাম? কিন্তু তুমি যে বলেছ তোমার এখানে থেকে যাওয়ার ইচ্ছে করছে,

www.doridro.com

সে জন্যেই আমি খুশি! আমার যখন মন খারাপ হবে তখন আমি তোমার এই কথাটা মনে করব!"

তখন মিথিলা তার মন খারাপের কথা বলল। তার মায়ের কথা বলল, তার মা কেমন করে মারা গেল সেই কথা বলল। তার স্কুলের কথা বলল, তার বন্ধুদের কথা বলল। বুলবুল তার জন্মের কথা বলল, জহুরের কথা বলল, আনোয়ারার কথা বলল। ডক্টর সেলিমের কথা বলল, লিপির কথা বলল। মিথিলা তার খেলার সাথীদের কথা বলল, তারপর গুনগুন করে একটা গান গেয়ে শোনাল।

ধীরে ধীরে যখন পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে তখন বুলবুল মিথিলাকে নিয়ে ফিরে আসে। তাকে লঞ্চের ছাদে নামিয়ে দিয়ে সে উড়ে যায়। তার সমস্ত শরীর ক্লান্ত কিন্তু বুকের ভেতর বিচিত্র এক ধরনের অনুভূতি—যার সাথে সে পরিচিত না। যেটা সে কোনোভাবে বুঝতে পারছিল না।

পরদিন ভোরে ডক্টর আশরাফ নাশতার টেবিলে তার মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে মেয়ের কেবিনে গিয়ে দেখতে পেল সে ঘুমে কাদা হয়ে আছে। ডক্টর আশরাফ ডেকে বলল, "মিথিলা, মা উঠবি না? নাশতা করবি না?"

মিথিলা ঘুমের মাঝে বিড়বিড় করে বলল, "খুব ঘুম পাচ্ছে আব্বু! আমি এখন উঠব না!"

ডক্টর আশরাফ মেয়েকে আর বিরক্ত করল না, সারারাত ঘুমানোর পরেও কেমন করে একজনের ঘুম পায় সেটা সে বুঝতে পারল না। এই বয়সী মেয়েদের তাদের বাবারা নিশ্চয়ই কখনো বুঝতে পারে না।

রাত্রিবেলা খাবার টেবিলে ডক্টর আশরাফ ঘোষণা করল তাদের এবারকার অভিযান শেষ, পরদিন ভোরে তারা ফিরে যাচ্ছে।

মিথিলা চমকে উঠে বলল, "ফিরে যাচ্ছি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন আব্বু? এত তাড়াতাড়ি কেন?"

ডক্টর আশরাফ হেসে ফেলল, বলল, "তাড়াতাড়ি? এই কয়দিন

www.doridro.com

আগেই তুই একেবারে অধৈর্য হয়ে গিয়েছিলি কখন ফিরে যাব! এখন বলছিস তাড়াতাড়ি?"

"হ্যাঁ আব্বু।" মিথিলা ইতস্তত করে বলল, "আগে আমার ভালো লাগছিল না। এখন ভালো লাগছে।"

"ভালো লাগলে ভালো। আমরা আবার আসব।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আরো কয়েক দিন থাকো না আব্বু। অন্য কিছু স্টাডি করো।"

"অন্য কী স্টাডি করব?"

"বনে কত কী আছে। গাছপালা সাপ ব্যাঙ গোসাপ—"

ডক্টর আশরাফ হেসে বলল, "আমি তো গাছপালা সাপ ব্যাঙের এক্সপার্ট না। আমি পাখির এক্সপার্ট—"

"তাহলে পাখিই স্টাডি করো!"

এ রকম সময় খাবার টেবিলের একপাশে বাস থাকা চশমা পরা একজন বলল, "স্যার, মিথিলার কথায় একটা যুক্তি আছে।"

"কী যুক্তি?"

"আজকে আমাদের লঞ্চের ছাদে এটা পেয়েছি।" বলে চশমা পরা ছেলেটি ডক্টর আশরাফের দিকে একটা পালক এগিয়ে দেয়। পালকটি কমপক্ষে এক ফুট লম্বা এবং সেটি দেখে এক সাথে সবাই বিস্ময়ের একটা শব্দ করল। ডক্টর আশরাফ পালকটি হাতে নিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বলে, "এর অর্থ তোমরা কি জান?"

"কী স্যার?"

"এর অর্থ এই পাখিটির ডানার বিস্তৃতি ছয় থেকে আট মিটার।"

"এটা কী পাখি স্যার?"

"আমি জানি না।"

একজন অবাক হয়ে বলল, "আপনি জানেন না?"

"না। আমার জানামতে এত বড় পাখি পৃথিবীতে নেই।"

"তাহলে এটা কোথা থেকে এল স্যার?"

ডক্টর আশরাফ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি জানি না।"

"আমরা কি এটা নিয়ে একটু স্টাডি করব? এটা খুঁজব?"

"আমরা গত কয়েক দিন যেভাবে স্টাডি করেছি তাতে এই পাখিটার

www.doridro.com

অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া উচিত ছিল। যেহেতু পাইনি—"

ডক্টর আশরাফ আবার চুপ করে যায়, চশমা পরা ছেলেটি বলল, "যেহেতু পাইনি?"

"যেহেতু পাইনি তার অর্থ, পাখিটা অনেক বুদ্ধিমান। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে।"

মিথিলা আস্তে আস্তে বলল, "হয়তো এটা পাখি না।"

"এটা পাখি না? এটা তাহলে কী?"

"হয়তো এটা পরী।"

সবার জোরে হেসে ওঠার কথা ছিল, কিন্তু কেউ হেসে উঠল না।

গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে গেছে তখন মিথিলা নিঃশব্দে লঞ্চের ছাদে উঠে এল। চাঁদের আলো খুব বিচ্ছিন্ন, জোছনা রাতে সেটি ঝলমল করতে থাকে কিন্তু একদিন পরেই মনে হয় তার ঔজ্জ্বল্য কমে এসেছে। মিথিলা চাঁদটির দিকে তাকিয়ে থাকে, দুই পাশে গহিন অরণ্য, সেখানে কোনো শব্দ নেই, কিন্তু তার মাঝে কত বিচিত্র প্রাণী তাদের জীবনকে তাদের নিজেদের মতো করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মিথিলা নিঃশব্দে লঞ্চের ছাদে পায়চারী করতে থাকে। চাঁদটা যখন একটু ঢলে পড়ল তখন সে দেখতে পেল বিশাল একটা পাখির মতো ডানা মেলে বুলবুল লঞ্চটাকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘুরছে। ধীরে ধীরে বৃত্তটিকে ছোট করে নিঃশব্দে বুলবুল লঞ্চের ছাদে নেমে এল।

মিথিলা এগিয়ে গিয়ে বুলবুলের হাত ধরে বলল, "তুমি এত দেরি করে এসেছ?"

বুলবুল ফিসফিস করে বলল, "আমি আরো আগে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু লঞ্চে মানুষজন জেগে আছে, চলাফেরা করছে; তাই দেরি হলো। কেউ আমাকে দেখে ফেললে কী বিপদ হবে জান?"

মিথিলা মাথা নেড়ে বলল, "জানি। বিপদ মনে হয় একটু হয়েছে।"

"কী বিপদ?"

"তোমার একটা পালক এইখানে খুঁজে পেয়েছে। সেইটা দেখে সবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সবাই বলছে, এত বড় পালক কোনো পাখির হতে পারে না।"

www.doridro.com

"সর্বনাশ।"

"হ্যাঁ। তোমাকে খুব সাবধান থাকতে হবে।"

"ঠিকই বলেছ।"

"তোমাকে যদি কেউ দেখে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

বুলবুল মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ। সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

মিথিলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা কাল সকালে চলে যাব।"

"চলে যাবে?"

"হ্যাঁ। আমার খুব মন খারাপ হবে।"

বুলবুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমারও।"

মিথিলা বলল, "আমার মনে হচ্ছে কেন তোমার সাথে দেখা হলো? দেখা না হলেই তো মন খারাপ হতো না।"

বুলবুল মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমার সেটা মনে হচ্ছে না। আমার কী মনে হচ্ছে জান?"

"কী?"

"আমার মনে হচ্ছে আমার কী সৌভাগ্য যে তোমার সাথে দেখা হলো, এখন আমি সারাজীবন তোমার কথা মনে রাখতে পারব।" বুলবুল আস্তে আস্তে বলল, "আমি যখন আকাশে উড়ব তখন ভাবব একদিন তোমাকে নিয়ে আমি আকাশে উড়েছিলাম।"

মিথিলা ফিসফিস করে বলল, "আমার আসলে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

বুলবুল কথাটির কোনো উত্তর দিল না, একটু পরে বলল, "তুমি কি আজকে আবার উড়তে চাও?"

"তোমার কোনো কষ্ট হবে না তো?"

"না। কোনো কষ্ট হবে না।"

"তাহলে চল যাই।"

কিছুক্ষণের ভেতর বুলবুল মিথিলাকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। ঠিক তখন একজন ডক্টর আশরাফের কেবিনে জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছিল। ডক্টর আশরাফ ঘুম থেকে উঠে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

"আপনি বিশ্বাস করবেন না স্যার। নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবেন না।"

www.doridro.com

"কী হয়েছে?"

"বিশাল বড় একটা পাখির পালক কোথা থেকে এসেছে আমি জানি।"

"কোথা থেকে।"

"একজন মানুষ, তার পাখির মতোন পাখা।"

ডক্টর আশরাফ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। বলল, "কী বলছ?"

"বলছি, একজন মানুষ তার পাখির মতো পাখা।"

"সে কোথায়?"

"মিথিলাকে নিয়ে আকাশে উড়তে গেছে। একটু পরে আসবে।"

"মি-মিথিলাকে নিয়ে? মিথিলাকে?"

"হ্যাঁ স্যার। মানুষটা মিথিলাকে চিনে, দুজন খুব বন্ধু। আমি স্যার তাদের কথা শুনেছি।"

ডক্টর আশরাফ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সবাইকে ডেকে তোলো। এই ক্রিয়েচারটাকে ধরতে হবে। মনে হয় এটা হবে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।"

ঘণ্টা দুয়েক পর যখন মিথিলাকে পিঠে নিয়ে বুলবুল লঞ্চের ছাদে নেমে এল তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি প্রায় দুই ডজন মানুষ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মিথিলা তার পিঠ থেকে নেমে যখন বুলবুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন এক সাথে সবাই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুহূর্তের মাঝেই বুলবুল বুঝে যায় কী হচ্ছে, সে তার শক্তিশালী পাখা দিয়ে আঘাত করে কয়েকজনকে নিচে ফেলে দেয়। পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, কেউ একজন একটা লোহার রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেছে, জ্ঞান হারিয়ে অচেতন হওয়ার আগে সে শুনতে পেল মিথিলা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলছে, "না! না! না!"

মিথিলাকে ডক্টর আশরাফ ধরে রাখতে পারছে না, আরো দুজন মিলে মিথিলাকে আটকে রেখেছে। সে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো চিৎকার করে কাঁদছে, তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

www.doridro.com

বুলবুলকে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। শুধু হাত বেঁধেই কেউ নিশ্চিত হতে পারেনি, তাই পা দুটিকেও শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। লঞ্চের ছাদে রেলিংয়ের সাথে তার শরীরটা বেঁধে রাখা হয়েছে। তার সারা দেহ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। সে জানত তাকে যদি ধরে ফেলতে পারে সেটাই হবে তার শেষ, তাই সে প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিল, এতগুলো মানুষের সাথে সে একা কিছুতেই পেরে ওঠেনি। শেষ মুহূর্তে একজন লোহার রড দিয়ে মাথায় মেরে বসেছে, তখন সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তা না হলে সে হয়তো কোনোভাবে নিজেকে মুক্ত করে উড়ে যেতে পারত। খুব ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। তার চারপাশে কী ঘটছে সে ভালো করে বুঝতে পারছে না। তার সামনে অনেক মানুষ, তাকে অবাক হয়ে দেখছে, এটুকুই সে বুঝতে পারে। শুনতে পেল কেউ একজন বলল, "জ্ঞান ফিরেছে! স্যারকে ডাকো। স্যারকে ডাকো।"

কিছুক্ষণের মাঝেই ডক্টর আশরাফ লঞ্চের ছাদে চলে এল। বুলবুলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো। তাকে ডাকল, "এই।"

বুলবুল চোখ খুলে তাকাল, কোনো কথা বলল না। ডক্টর আশরাফ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

বুলবুল কোনো কথা বলল না। তার কথা বলার ইচ্ছে নেই, তা ছাড়া সে কোথা থেকে এসেছে সেটা সে কাউকে কেমন করে বোঝাবে? ডক্টর আশরাফ আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

বুলবুল কোনো উত্তর দিল না। ডক্টর আশরাফ আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী?"

বুলবুল কষ্ট করে চোখ তুলে ডক্টর আশরাফের দিকে তাকালো, তারপর ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি না। আপনি বলবেন আমি কী?"

www.doridro.com

ডক্টর আশরাফ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর উঠে দাঁড়ায়। যারা তার আশপাশে ছিল তাদের লক্ষ করে বলল, "এই ক্রিয়েচারটাকে একটু পরীক্ষা করা দরকার। মেডিকেল পরীক্ষা।"

একজন একটু এগিয়ে এসে বলল, "করেছি স্যার।"

"কী দেখেছ?"

"অনেক ব্লাড লস হয়েছে। মানুষ হলে বলতাম রক্ত দিতে হবে। কিন্তু এটা তো মানুষ না, কী বলব বুঝতে পারছি না। কী ট্রিটমেন্ট করব বুঝতে পারছি না।"

"বেঁচে থাকবে?"

"জানি না স্যার। মাথার পেছনে রড দিয়ে মারা হয়েছে, ব্রেন ইনজুরি হয়েছে কি না বুঝতে পারছি না। মানুষ হলে এতক্ষণে মরে যেত।"

ডক্টর আশরাফ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এই প্রাণীটা মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রাণী। চেষ্টা করো এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে।"

"চেষ্টা করব স্যার।"

"তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য বেঁচে না থাকলে ভালো।"

"কেন স্যার?"

"প্রাণীটার মানুষ অংশটা খুব প্রবল। আমার মেয়েকে মুগ্ধ করে ফেলেছে, বুঝতে পারছ না? যদি তার কথাবার্তা চিন্তাভাবনা মিডিয়াতে চলে আসে সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবাই তখন এটার ইমোশনাল অংশটা নিয়ে কথা বলবে। সায়েন্টিফিক অংশটা চাপা পড়ে যাবে।"

"তাহলে কি স্যার এটাকে মেরে ফেলব?"

"এই মুহূর্তে না। আমাদের ঢাকা ফিরতে ফিরতে এখনো তিন দিন। এর আগে আমরা কাউকে কিছু জানতে দিচ্ছি না। এই তিন দিন নিজেরা এটাকে স্টাডি করি। ঢাকায় ফেরার পর দেখা যাক। কাজেই তোমরা কেউ বিশ্রাম নেবে না, সবাই কাজ কর।"

উৎসাহী বিজ্ঞানীরা মাথা নাড়ল, বলল, "জি স্যার। আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি না।"

"ছবি ভিডিও তোলার আগে রক্ত মুছে নিও। ইনজুরিগুলো যেন দেখা না যায়—প্রাণীটার মাঝে মানুষ মানুষ ভাব থাকায় মুশকিল। কেউ দেখলে

www.doridro.com

অন্য রকম ভাবতে পারে!"

"জি স্যার। এখন মানুষের সমস্যা নিয়ে মানুষেরা যত ভাবে পশুপাখির সমস্যা নিয়ে তার থেকে বেশি ভাবে।"

"ঠিকই বলেছ।"

ঠিক এ রকম সময় মিথিলাকে তার কেবিনে আটকে রাখা হয়েছিল। যে মানুষটি তার জন্যে খাবার এনেছে সে খানিকটা নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে আছে, কারণ মিথিলা পুরো ভাত তরকারি তার মুখের ওপর ছুড়ে মেরেছে। খবর পেয়ে ডক্টর আশরাফ এসেছে। তাকে দেখে মিথিলা অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বলল, "আব্বু।"

"বলো মিথিলা।"

"এটা কি সত্যি তুমি ওদের বলেছ আমাকে কেবিনের মাঝে তালা মেরে রাখতে?"

ডক্টর আশরাফ বলল, "এটাকে অন্যভাবে নিও না। তোমার ভালোর জন্য আমরা তোমাকে এখানে আটকে রাখছি।"

"আমার ভালোর জন্যে?" মিথিলা চিৎকার করে বলল, "আমার ভালোর জন্যে?"

"হ্যাঁ। তুমি অত্যন্ত নির্বোধের মতো কিছু কাজ করেছ।"

"কী কাজ করেছি?"

"পাখাওয়ালা ঐ প্রাণীটার সাথে ওড়ার চেষ্টা করেছ! তুমি কি জান তুমি কত বড় ঝুঁকি নিয়েছিলে?"

"কীসের ঝুঁকি?"

"প্রাণীটা যদি তোমাকে ওপর থেকে ফেলে দিত?"

"ফেলে দিত? আমাকে? কেন আমাকে ফেলে দিবে?"

ডক্টর আশরাফ বলল, "এ রকম ভয়ঙ্কর একটা বন্য প্রাণী যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তুমি কেমন করে তার পিঠে উঠে আকাশে উড়তে গেলে? তোমার কি বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই?"

"আব্বু! ও মোটেও বন্য প্রাণী না—"

"আমার সাথে তর্ক করবে না। আমি এই বিষয়গুলো তোমার থেকে অনেক বেশি জানি। তুমি কি জানো সে কত হিংস্রভাবে আমার স্টুডেন্টদের

www.doridro.com

আক্রমণ করেছে? আরেকটু হলে এটা তাদের মেরেই ফেলত।"

"আব্বু! তোমরা ওকে ধরার চেষ্টা করেছ আর সে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে না?"

ডক্টর আশরাফ মাথা নেড়ে বলল, "খুব একটা লাভ হয় নাই। তাকে আমরা ঠিকই ধরেছি।"

"শুধু ধরো নাই তাকে তোমরা মেরেছ।" হঠাৎ করে মিথিলার গলা ভেঙে গেল, বলল, "কেমন আছে এখন?"

"আছে একরকম।"

"বেঁচে আছে, নাকি তোমরা মেরে ফেলেছ?"

"মেরে ফেলব কেন?"

"লোহার রড দিয়ে তোমরা তার মাথায় মেরেছ—"

"আমাদের সেফটির জন্যে। একটা বন্য প্রাণী আমাদের আক্রমণ করবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব?"

মিথিলা একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আমাকে কেবিন থেকে বের হতে দিবে?"

"না।"

"ওকে একবার দেখতে দিবে?"

"কোনো প্রশ্নই আসে না।"

"আমাকে বাথরুমেও যেতে দিবে না?"

"সেটা দেব, তবে খুব সাবধানে। দেখতে হবে তুই যেন কোনো পাগলামি না করিস।" একটু থেমে যোগ করল, "আমরা ঢাকা রওনা দিয়ে দিয়েছি, দুই দিনে ঢাকা পৌঁছে যাব, তখন তোর যা ইচ্ছে হয় করিস।"

ডক্টর আশরাফ চলে যাওয়ার পর মিথিলা কেবিনটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করল। লোহার দেয়াল, লোহার দরজা, ভেঙে বের হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। দরজার মাঝে কাচ লাগানো আছে, সেই কাচ ভেঙে ফেলা যাবে কিন্তু বড় জোর সে তার হাতটা বের করতে পারবে। যদি কোনোভাবে তালার চাবিটা পেতে পারত তাহলে হাত বের করে তালাটা খুলতে পারত। কিন্তু চাবি পাবে কোথায়?

ঠিক তখন তার একটা জিনিস মনে পড়ল, বাথরুমেও তালা দেয়া

www.doridro.com

আছে। ভাড়া করা লঞ্চ, কেবিনের প্যাসেঞ্জারের জন্যে আলাদা বাথরুমে রয়েছে। সাধারণ মানুষেরা যেন যেতে না পারে সে জন্যে তালা মারা থাকে, কেবিনের মানুষেরা যাওয়ার সময় চাবি নিয়ে খুলে বাথরুমে যায়। বাথরুমের চাবিটা প্রথমে নিজের কাছে রাখতে হবে, তারপর খুব সাবধানে তার কেবিনের তালাটাকে বাথরুমের তালা দিয়ে পাল্টে দিতে হবে। তারপর যখন কেউ লক্ষ করবে না তখন দরজার কাচ ভেঙে হাত বের করে চাবি দিয়ে তালাটা খুলে ফেলতে হবে, কাজটা সহজ নয় কিন্তু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

কাজেই মিথিলা খুব ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করল। সে এর আগে কখনোই এ রকম কিছু করেনি, আজকে করবে। খুব ঠান্ডা মাথায় সে পুরোটা করবে, একটা শেষ চেষ্টা করবে।

রাতের খাবারটা সে আগের বারের মতো মানুষটার মুখে ছুড়ে দিল না। সে খানিকটা খেলো এবং খানিকটা লুকিয়ে রাখল। গভীর রাতে সবাই যখন মোটামুটি ঘুমিয়ে গেছে, তখন সে ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখা ভাত-তরকারি পানির সাথে মিশিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে বমি করার মতো শব্দ করতে থাকে। সাথে সাথে দরজায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ করতে থাকে।

কিছুক্ষণের মাঝেই খবর চলে গেল এবং ডক্টর আশরাফ উদ্বিগ্ন মুখে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে মিথিলা?"

"শরীর খারাপ লাগছে আব্বু। বমি হচ্ছে।"

"বমি হচ্ছে? কেন?"

"জানি না।" বলে আবার সে বমি করার ভঙ্গি করল, মনে হলো আবার বমি করে দেবে। ডক্টর আশরাফ তাকে ধরল, মিথিলা দরজার কপাট ধরে বমি করার ভঙ্গি করে দরজায় লাগানো তালাটা সাবধানে খুলে নেয়।

মিথিলা টলতে টলতে হেঁটে বাইরে ঝোলানো বাথরুমের চাবিটা নিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। ডক্টর আশরাফ বলল, "আমি খুলে দিই।"

মিথিলা বিড়বিড় করে বলল, "আমি পারব।"

সে বাথরুমের তালাটা খুলে হাতে নিয়ে সেখানে তার ঘরের তালাটা ঝুলিয়ে দেয়। বাথরুমের ভেতর ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে একটা বড় নিঃশ্বাস নেয়। এখন পর্যন্ত সবকিছু পরিকল্পনামতো হয়েছে। মিথিলার ইচ্ছে করল সে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দেয়। বাথরুমের ভেতর সে কয়েকবার বমি করার শব্দ করল, তারপর পানি ছিটিয়ে হাত-মুখ ধুতে শুরু করল। সে

www.doridro.com

তার স্যুটকেসের চাবিটা নিয়ে এসেছে, সুতলি দিয়ে বাঁধা বাথরুমের চাবিটার জায়গায় স্যুটকেসের চাবিটা লাগিয়ে নেয়। বাথরুমের চাবিটা কোমরে গুঁজে নিয়ে সে বাথরুম থেকে বের হলো, বাইরে ডক্টর আশরাফ ঘুমঘুম চোখে দাঁড়িয়ে ছিল, মিথিলাকে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ ঠিক আছে।"

"তাহলে ঘুমিয়ে যা।"

"ঘুম আসছে না। তোমার কাছে ঘুমের ট্যাবলেট আছে?"

"হ্যাঁ, আছে।"

"বেশি করে কয়েকটা দেবে? খেয়ে ঘুমাব।"

"বেশি করে নয়। একটা দিচ্ছি, খেয়ে ঘুমিয়ে যা।"

মিথিলা তখন সুতলিতে বাঁধা স্যুটকেসের চাবিটা বাথরুমের চাবি হিসেবে আগের জায়গায় ঝুলিয়ে দেয়, তারপর নিজের ঘরে ঢোকে, ঢোকার সময় দরজার কড়ায় সে বাথরুমের তালাটা ঝুলিয়ে দিল। তারপর ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

ডক্টর আশরাফ একজন লোককে ডাকিয়ে মিথিলার ঘরটা একটু পরিষ্কার করিয়ে দেয়। তারপর মিথিলার হাতে একটা ট্যাবলেট দিয়ে বলল, "এটা খেয়ে ঘুমিয়ে যা।"

"দুইটা দাও।"

"দুইটা লাগবে না। একটাই যথেষ্ট।"

"না আব্বু। আমাকে দুইটা দাও। আমি মড়ার মতো ঘুমাতে চাই।"

একটু ইতস্তত করে ডক্টর আশরাফ তাকে দুইটা ট্যাবলেট দিল। মিথিলা দুইটা ট্যাবলেট নিয়ে মুখে দিয়ে ঢক ঢক করে পানি খেয়ে বলল, "এখন আমি ঘুমাব।"

ডক্টর আশরাফ বলল, "হ্যাঁ, এখন ঘুমিয়ে যা।"

"গুড নাইট আব্বু।" বলে সে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে জিভের নিচে লুকিয়ে রাখা ট্যাবলেট দুটো বের করে ফেলল, কী কুৎসিত গন্ধ, মনে হলো এবারে বুঝি সে সত্যি সত্যি বমি করে দেবে।

মিথিলা আরো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করল তারপর সে উঠে বসল। কেউ এখন তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না, সবাই জানে সে দুইটা ঘুমের ট্যাবলেই

www.doridro.com

খেয়ে মরার মতো ঘুমাচ্ছে। মিথিলা স্যুটকেস থেকে তার একটা টি-শার্ট বের করে হাতে পেঁচিয়ে নিয়ে সাবধানে দরজার কাচে আঘাত করে। দরজার কাচকে সে যতটুকু শক্ত ভেবেছিল সেটা তার থেকে অনেক বেশি শক্ত। কোনো কিছু দিয়ে জোরে আঘাত করে ইচ্ছে করলেই সে কাচটা ভেঙে ফেলতে পারে কিন্তু সে কোনো শব্দ করতে চাচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টার পর কাচে একটা ফাটল তৈরি হলো, তখন সে সাবধানে চাপ দিয়ে একটা বড় টুকরো আলাদা করে নেয়। চাপ দিয়ে সাবধানে আরো একটু ভেঙে সে আরো কয়েক টুকরো কাচ সরিয়ে নেয়। এখন মোটামুটিভাবে হাত বের করার মতো জায়গা হয়েছে। চাবিটা নিয়ে সে হাতটা বাইরে বের করে দরজার কড়াতে লাগানো তালাটা খোলার চেষ্টা করে। দুই হাতে যে কাজটি পানির মতো সহজ, এক হাতে সেই কাজটিই প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। তার ভয় করছিল হঠাৎ করে তার হাত থেকে চাবিটা না নিচে পড়ে যায়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!

শেষ পর্যন্ত মিথিলা তালার ভেতর চাবি ঢোকাতে পারল এবং একটু চাপ দিতেই তালাটা খুট করে খুলে যায়। মিথিলা দরজার কড়া থেকে তালাটা খুলে নিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি সে শেষ পর্যন্ত মুক্ত হতে যাচ্ছে।

মিথিলা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর খুব সাবধানে দরজা খুলে কেবিন থেকে বের হয়ে আসে। বাইরে আবছা অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই। লঞ্চের ইঞ্জিনের ধ্বক ধ্বক শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। মিথিলা রেলিংয়ের পাশে এসে দাঁড়ায়, পানি কেটে লঞ্চটা এগিয়ে যাচ্ছে বাইরে আবছা অন্ধকার। মিথিলা আবার নিজের কেবিনে ঢুকে একটা পানির বোতল আর তার নিজের একটা তোয়ালে নিয়ে খুব সাবধানে বের হয়ে এল। এদিক সেদিক তাকিয়ে সে এবারে সাবধানে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল ছাদে ওঠার দরজায় কেউ থাকবে, কিন্তু সেখানে কেউ নেই। তার আরো বেশি ভয় হচ্ছিল উপরে কেউ পাহারায় থাকবে কিন্তু ভাগ্য ভালো সেখানেও কেউ নেই।

ছাদের রেলিংয়ে বুলবুলকে বেঁধে রেখেছে। সে মাথা নিচু করে অবসন্নের মতো বসে ছিল, মিথিলা ছুটে গিয়ে তাকে স্পর্শ করতেই সে চোখ খুলে তাকালো, মিথিলাকে দেখে মুহূর্তের মাঝে তার মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে। সে নরম গলায় বলল, "তুমি?"

www.doridro.com

"হ্যাঁ। আমি। আমাকে আটকে রেখেছিল, কোনোমতে পালিয়ে এসেছি!"

"আমি ভাবি নাই তোমার সাথে আর দেখা হবে।"

"আমিও ভাবি নাই।" মিথিলা তার মাথায় গালে হাত বুলিয়ে বলল, "কেমন আছ তুমি?"

"ভালো ছিলাম না। তুমি এসেছ এখন আমি খুব ভালো আছি।"

মিথিলা বলল, "কেউ এসে পড়বে। আগে তোমাকে খুলে দিই।"

বুলবুল কোনো কথা বলল না। মিথিলা তার বাঁধন খুলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। খুব শক্ত করে বেঁধেছিল, মিথিলার খুব কষ্ট হলো বাঁধন খুলতে। শেষ পর্যন্ত যখন খুলতে পারল তখন বুলবুল তার দুই হাত আর পায়ে হাত বুলিয়ে হাসার চেষ্টা করল।

মিথিলা টাওয়েলটা ভিজিয়ে তার মুখ থেকে শুকনো রক্ত মুছিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি এখন যাও। কেউ এসে পড়ার আগে তুমি যাও। এক্ষুণি যাও।"

বুলবুল অনেক কষ্ট করে হাসার চেষ্টা করল, বলল, "আমার যাওয়ার ইচ্ছে করছে না।"

মিথিলা তাকে টেনে দাঁড়া করিয়ে দিয়ে বলল, "লক্ষ্মী ছেলে আমার! ইচ্ছা না করলেও তোমাকে যেতে হবে।"

বুলবুল নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল কোনোমতে মিথিলাকে ধরে সামলে নেয়। নিজের পাখা দুটো একবার বিস্তৃত করে দেখে নেয় তারপর সে মিথিলার দিকে তাকালো, বলল, "ঠিক আছে মিথিলা।"

মিথিলা তার দুই হাত এগিয়ে দিয়ে বুলবুলকে গভীর মমতায় আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে বলল, "যাও! তুমি উড়ে যাও।"

বুলবুল কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে মিথিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব ধীরে ধীরে তার দুই চোখ পানিতে ভরে ওঠে। সে ফিসফিস করে বলল, "মিথিলা।"

"বল।"

"তুমি আমাকে মনে রেখো।"

"মনে রাখব। আমি তোমাকে মনে রখব।"

"আমি তাহলে যাই?"

"যাই বলতে হয় না। বলতে হয় আসি।"

www.doridro.com

"আমি তাহলে আসি?"

"আস বুলবুল।"

বুলবুল তখন এগিয়ে যেতে থাকে। খুব ধীরে ধীরে তার দুই পাখা বিস্তৃত করে ডানা ঝাপটিয়ে সে উপরে উঠে যায়। মিথিলা দেখতে পায় বিশাল শক্তিশালী দুটি পাখা দুর্বল ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে উপরে তুলে নেয়ার চেষ্টা করছে, অনেক কষ্টে সে উড়ে যাচ্ছে, উড়ে যেতে যেতে সে একবার পেছনে ফিরে তাকালো।

মিথিলা তার মুখে অনেক কষ্টে একটা হাসি ধরে রাখে। হাসি হাসি মুখে সে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে তার হাত নাড়ে। বুলবুল আবার মাথা ঘুরিয়ে নিল, তারপর ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যেতে লাগল। খুব ধীরে ধীরে সে দূরে সরে যেতে থাকে, মিলিয়ে যেতে থাকে।

পুবের আকাশে তখন সূর্য উঠছে, দেখে মনে হয় বুলবুল বুঝি ডানা ঝাপটিয়ে ঠিক সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইকারাসের মতো।

মিথিলা তখন তার দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কাঁদল।

www.doridro.com

শেষ কথা

মিথিলা তার শিশু সন্তানটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ঘুমাও বাবা আর কত দুষ্টুমি করবে?"

"আগে তুমি গল্প বল, তাহলে ঘুমাব।"

মিথিলা তখন তাকে ডেডিলাসের পুত্র ইকারাসের গল্প বলল। ইকারাস তার ডানা ঝাপটিয়ে কীভাবে সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই গল্পটুকু বলার সময় মিথিলা কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। তার শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

আম্মু কেন এটা করে মিথিলার শিশুপুত্র বুলবুল সেটা কখনো বুঝতে পারে না। বুলবুল শুধু একটা জিনিস জানে—তার আম্মু তাকে খুব ভালোবাসে, কারণে-অকারণে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, "বুলবুল! আমার সোনা বুলবুল!"

DORIDRO.COM